ছিন্ন-হার।

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

ছিন্ন-হার।

জীবনের অবলম্বন—

সাহিত্য-দেবতার কোমল কান্ত কণ্ঠদেশে অর্পণ করিবার

নিমিত্ত সাধ করিয়া বহু পরিশ্রমে যে

রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া উজ্জ্বল

হার গ্রথিত করিতে

বসিয়াছি ;

ভক্তির অভাবে, অধমের হাতে পড়িয়া রত্ন জ্যোতিহীন,

হার ছিন্ন ; সুতরাং এই অনিবেদিত ম্লান "ছিন্নহার"

সাধনার একটী বাহ্য নিদর্শন

বলিয়া, সেবার একটা

অস্ফুট চিহ্ন বলিয়া

তোমরা আদর

করিবে না

কি ?

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—

শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য

৭৮।২নং, হ্যারীসন রোড।

অন্নদা বুকষ্টল।

Printed by
B. N. NANDI, at the KAVIRATNA PRESS,
32, Simla Street,
Calcutta.

মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই—১।০

সাধারণ বাঁধাই—১

আমার আরাধ্য

মাতুল

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

মহোদয়ের

শ্রীচরণ-কমলে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

সেবক—

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

নিবেদন।

ছিন্নহার প্রকাশিত হইল। ভাল হউক বা মন্দ হউক গ্রন্থ প্রকাশ করা যাহাদের সখ, আমিও অবশ্যই সেই শ্রেণীর মধ্যে। সাহিত্যের বাজারে আমাদের ন্যায় গ্রন্থকারের আদর থাকুক বা না থাকুক খোস-খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের কবিযশঃপ্রার্থী হৃদয়টা লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এই অপরাধের ক্ষমা চাহিবার আমার সাহস নাই।

এই গ্রন্থের মধ্যে যে কয়টী গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "সোমদেব," "ভূতলে অতুলনীয়" ও "পূজারী" নামক তিনটী গল্প 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অন্য সমস্ত গল্পই নূতন লিখিত।

'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া একসময়ে আমার চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল যে, আমাদের পুরাণ ইতিহাস ও কাব্যাদিতে যে সমস্ত গল্প প্রভৃতি কোথায় অস্ফুট কোথাও পরিস্ফুট আকারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সংগোপিত আছে, তাহা চয়ন করিয়া আধুনিক প্রণালীতে সংস্কার করিয়া বাহির করিতে পারিলে বোধ হয় সাহিত্যক্ষেত্রে অতি প্রিয় হইতে পারে। অবশ্য কোন কোন মহাত্মা যে এই পথে পদার্পণ করেন নাই, তাহা নহে, তথাপি পাঠকের হিসাবে এই সংখ্যা অতি অল্প। আমি "সোমদেব," ও "পত্রলেখা" নামক দুইটী গল্প "শ্রীমৎভাগবত" ও "কাদম্বরী" হইতে উদ্ধার করিয়া আধুনিক প্রণালীতে রচিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। জানি না সফলকাম হইয়াছি কি না? বলা বাহুল্য এই দুইটী গল্পের কোথাও কোনটীতে মাত্র ছায়া গ্রহণ করিয়া কল্পনার সাহায্যে নূতন মূর্ত্তি গঠন করিয়াছি, কোথাও বা অনেকাংশ

অবিকল রাখিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছি। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বহু বৎসর পূর্ব্বে জন্মভূমি পত্রিকায় "মদালসাপরিণয়" নামে একটী পৌরাণিককাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আমার "প্রতিশোধ" গল্পের—প্লট্‌টা সেই কাহিনীরই রূপান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য এই কাহিনীটীকেও পৌরাণিকযুগের একটী মর্ম্মান্তিক ঘটনা বলা যাইতে পারে। কারণ ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত আছে। পরিশেষে নিবেদন,—এই গ্রন্থ প্রকাশ করার কল্পনাবীজ আমার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত করিয়া আমার স্নেহের, আদরের শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহাকে উৎসাহসলিলসেকে বড় করিয়া আজ ফলফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই আজ আমার সেই পুরাতন কল্পনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাজারে বাহির হইতে পারিয়াছে।

কলিকাতা,
৬২নং, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।
১৩২৩, আষাঢ়,
রথযাত্রা।

নিবেদক—
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

তাহার এই ছোট কথাকয়টী এমনিভাবেই শুনাইল যে, যেন তাহার আর কোথাও কোন অবলম্বনের নাই, যেন তাহার এই ক্ষীণ অঙ্গলতিকার উপর শত ঝঞ্ঝাবাতেও কথা কহিবার বা নড়িয়া বসিবারও কিছু নাই।

রমেশ শান্তির ভিতরটা অত তলাইয়া না বুঝিয়া বলিল—"আমি ত যেতে পাব্‌ব না। তা' তোমার সঙ্গে একজন দাসী ঠিক ক'রে দিই, কি বল? যাওয়া ভাল,—কুটুম্বেরা যখন অত ক'রে লিখেছে!"

কুটুম্বেরা অত করিয়া লিখুক বা না লিখুক—ধর্ম্মবুদ্ধি রমেশের বুদ্ধিকে কর্ত্তব্যপথে চালিত করুক বা না করুক—সে অতশত ভাবে নাই। স্বার্থের দিক্‌টা পরিষ্কার রাখিয়া—ধর্ম্মবুদ্ধি বা কর্ত্তব্য জ্ঞান বা আত্মীয়তা করা বা আর কিছু যাহাই কয় না কেন—তাহাতে তাহার কিছু আসিয়া যায় না। বরং এই রকম উপলক্ষ পাইয়া যদি স্বার্থের দিক বিশেষ খোলসা হইয়া যায়, তবে রমেশের উৎসাহের সীমা থাকে না। শান্তিকে এই কুটুম্ববাড়ীতে প্রেরণব্যাপারে সে তাহার স্বার্থ সিদ্ধির একটা বেশ সুযোগ পাইয়াছিল। মণীন্দ্রের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া কুটুম্ব বাড়ীতে প্রেরণচ্ছলে শান্তির সজীব ভারটা যদি তাহার স্কন্ধ হইতে কোন রকমে নামিয়া বসে, তবে তাহা অপেক্ষা আর সুখের কথা কি হইতে পারে? মণীন্দ্রের উদ্দেশ্য যাহাই থাক্‌—রমেশ ত নিশ্চিন্ত,—তাহা হইলেই হইল। শান্তিও যে এ কথা বুঝিত না—তাহাও নহে।

শান্তির মুখ হইতে কোন সজীব জবাব ফিরিয়া আসিল না বটে, কিন্তু মণীন্দ্র কোথা হইতে সেখানে আসিয়া রমেশকে নমস্কার করিয়া বলিল—"রমেশ দা! তা হ'লে আজই যেতে হয়।"

রমেশের তাহাতে বড় একটা আপত্তি ছিল না, সে আনন্দিত হইয়া বলিল—"এই আসছ নাকি ? শচীন্দ্র ভাল আছে ?"

"সে আর ভাল নেই ? কাল বাদে পরশু তার বিয়ে! বলব কি দাদা! মেয়ে বাড়ীর খরচ একাই সে বহন করচে।" কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মণীন্দ্র শান্তির সেই বিষাদক্লিষ্ট মুখের দিকে একবার চাহিয়া নিজের মনেই বলিতে আরম্ভ করিল—"এক দিনের সম্বন্ধ ত নয়, তাই এত। তা' আমাদের গিরিবালার কপাল ভাল!"

গিরিবালার কপাল ভাল কি ভাল নয় সে সম্বন্ধে মণীন্দ্রের কোন তর্ক ছিল না; শান্তি যে শচীনের উপর আপনার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি ঢালিয়া দিয়া, আশা করিয়া না হউক—কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিয়া না হউক—তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিবে—ইহা তাহার অসহ্য। তাই সে শান্তির হৃদয় হইতে শচীন্দ্রের স্মৃতিকে বিশ্লিষ্ট করিবার নিমিত্ত এই আয়োজন করিয়াছিল।

গিরিবালার সঙ্গে শচীনের যে বিবাহ হইবে এবং সেই গিরিবালার বিবাহের নিমন্ত্রণে যে তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে—এতটা কথা শান্তি জানে নাই। সে বুঝিয়াছিল—গিরিবালার আর কোথাও বিবাহ হইবে। তাই সেখানে যাইতে তাহার অন্য কারণে আপত্তি থাকিলেও ঠিক এই কারণে আপত্তি ছিল না।

মণীন্দ্রের কথায় এই ভাবটা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের ভাবটা ঠিক কেমন হইয়াছিল,—তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু কোন্ অনির্দ্দেশ্য কারণে জানি না তাহার চোখের কোলে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া আসিয়া শুভ্র মুক্তাশ্রেণীর শোভা ধারণ করিল।

ক্ষণপরেই সে সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া রমেশের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—"তবে ক'খন্ যেতে হ'বে, কাকা ?"

রমেশও মৃণীন্দ্র অবাক্ হইয়া গেল।

(৮)

শচীনের বিবাহ হইয়া গেল। ধুমধাম বা ঘোর ঘটার মধ্যে শুভদৃষ্টি বা শুভ মিলন ব্যাপারটা এমনি ক্ষণৈকের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল যে, বর ও বধূ বুঝিতে পারিল না—কখন কোন মুহূর্ত্ত-মধ্যে এমন একটা নূতন কিছু সম্বন্ধ আসিয়া হাজির হইল যে, তাহার অতীত জীবনের একলা প্রাণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া দুখানা করিয়া ফেলিয়াছে। শচীনের মনে যাহাই থাক্—তামা-তুলসী হাতে করিয়া নারায়ণকে সাক্ষী রাখিয়া সে নিয়ত প্রতিধ্বনিত পিতৃ-আজ্ঞার যে দানটা গ্রহণ করিয়াছে—তাহা তুচ্ছ করিবার নহে,—অনাদরেরও নহে।

এই মস্ত দানটা গ্রহণ করিয়া সে যখন পিতৃসত্যটাকে হাল্কা করিয়া নিজের প্রাণটাকেও লঘু বলিয়া ভাবিল,—স্ত্রী আচারের মধ্যে যখন সেই কাণমলা গুলা হজম করিতে প্রবৃত্ত হইল—তখনিই পার্শ্বে একখানা কত কালের পরিচিত—কত অতীতকালের অমানিশার অন্ধকারের ভিতর হইতে সদ্য নির্গত একটি নারীমূর্ত্তি, তাহারই দিকে চাহিয়া রক্তহীন শুভ্রবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নারী সেই শান্তি! পৃথিবীর সুখদুঃখের সঙ্গে যোঝাযুঝি করিয়া যখন প্রবল দুঃখের আক্রমণে সুখের আধিপত্যটা ছুটিয়া যায়, যখন প্রজাপতির অনির্দ্দেশ্য কঠোর শাসনে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে কালো কালো দুঃখের মসীলিপিগুলি

আপনার একমেবাদ্বিতীয় আধিপত্যটা ঘোষণা করে, তখন মুখে তাহার রাজত্বের চিহ্নস্বরূপ শ্বেত পতাকা ধারণ করা ছাড়া—আর কোন উপায় থাকে না। নারী-প্রকৃতি বুঝা ভার! আজ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও শান্তি হাসিতেছে, কৌতুক করিতেছে।

শচীন্দ্রের অন্তরাত্মাটা কাঁপিয়া উঠিল। বিবাহমণ্ডপের বড় বড় বাতিগুলাও তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাল করিয়া সমস্ত আঁধারটা দূর করিতে পারিল না। বিবাহ উৎসবের সেই জনসঙ্ঘের কোলাহল, আত্মীয় কুটুম্বের সেই অযাচিত প্রীতিপ্রবাহ, এবং বাসরঘরের মধ্যে নবীনাগণের অপেক্ষিত হাঁসির উৎস—বরের এই আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে কেমন যেন একটু অনুৎসাহের মধ্যে পড়িয়া বেসুরা হইয়া গেল।

বিবাহের সেই নূতন কাপড়ের গাঁটছড়াটা কন্যার ঘাড়ের উপর চাপাইয়া সে যখন দুই চক্ষুর দৃষ্টির দুগ্ধধবল প্রবাহকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়াও শান্তির সাক্ষাৎ পাইল না, তখন সে ছল করিয়া সেই বিবাহ-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রি তেমন গভীর না হইলেও, অন্ধকারের মাত্রাটা অমাবস্যার সূচীভেদ্য আবরণে আবৃত না থাকিলেও, শচীন্দ্রের চক্ষুতে চারিদিক্‌টা কিন্তু গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইতস্তত নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্বচিৎ দুই একটা শৃগালের আকস্মিক প্রচণ্ড রব সুপ্ত চেতনাকে প্রতিহত করিলেও সে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কি যেন লক্ষ্যে কি যেন অপ্রাপ্য বস্তুর প্রত্যাশায় গ্রামের প্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্র নদীর দিকে ছুটিল। কে যেন তাহার প্রাণকে জোর করিয়াই বলিতেছিল—এদিকে, এদিকে, এদিকে !!!

(৯)

মণীন্দ্রের অবস্থা ভাল নহে। এমন একটা সাংঘাতিক বাহ্যিক বিকার বা কিছু অবশ্য তাহার শরীরে হয় নাই—যাহাতে তাহার জন্য অন্ত্যেষ্টির যোগাড় করিতে হইবে। রোগ তাহার মনে; সেই যে শচীনের সঙ্গে মধুপুরে গিয়া শান্তির অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিয়া অন্তরে বিষের জ্বালা লইয়া ফিরিয়াছিল—তাহাই তাহাকে জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য শান্তির সঙ্গে তাহার বিবাহ প্রস্তাবটা যে সে করে নাই—তাহা নহে; কিন্তু শান্তির সেই শচীনের প্রতি একমুখী ভালবাসাই মণীন্দ্রের আশা-ভরসা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। সে কত ছলে, কত কৌশলে মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার মনে ব্যথা দিয়াছে, পীড়ন করিয়াছে, খোসামোদও করিয়াছে—কিন্তু কিছুতেই শান্তির মন পায় নাই। সেও অবশ্য শান্তির আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে নাই। প্রতিদিনই তাহার কার্য্য, তাহার চিন্তা, তাহার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া উন্মাদের ন্যায় তাহার পিছু পিছু ছুটিয়াছে—কিন্তু শান্তির সেই অতলস্পর্শী হৃদয়ের কোণে তরঙ্গ তুলিয়া নিজের আকুল প্রাণের স্পন্দনটাও তাহাতে জাগাইতে পারে নাই।

শচীনের বিবাহের দিনেও সে প্রতিদিনের নিয়মিত কার্য্যের পর শান্তকে অদৃশ্যে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছিল। বিবাহের পর শান্তির অনির্দ্দেশ্য গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে যখন ধীরে ধীরে নদীর তীরে উপস্থিত হইল—তখন দেখিল—শান্তি ঘাটের ধারে একখানা উপলখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

উপরে নীল আকাশের গায়ে অগণ্য তারাশ্রেণী ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পদতলে নদীর বীচিমালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া থাকিয়া থাকিয়া

আছাড় খাইতেছিল। কোথায়ও কোন ঝাউ বৃক্ষের ডালপালাগুলা শোঁ শোঁ করিয়া আপনাদের উদ্দেশ্যহীন প্রাণের বেদনা জানাইতেছিল। শান্তি কিছু দেখিতেছিল না বা শুনিতেও ছিল না। তাহার প্রাণের মধ্যে যে প্রলয়ের ভীমবিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার গভীর আরাবে তখন তাহার কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।

পিছন হইতে মণীন্দ্র ভীমস্বরে ডাকিল—"শান্তি!"

শান্তি বিস্মিত হইয়া দৃপ্তা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিল,—"তোমার হাত হতে কি আমার অব্যাহতি নাই? পাপিষ্ঠ!"

মণীন্দ্রের প্রাণের কোমল তন্ত্রীগুলা বড় বেসুরা বাজিল। সেও জ্ঞান হারাইয়া উচ্চকণ্ঠেই বলিল—"নাই।"

শান্তি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র। যখন সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া চাহিল,—তখন মণীন্দ্র তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মণীন্দ্র বলিল—"আমি অনেক সহ্য করেছি শান্তি! জীবনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি, তোমাকে না পেলে আমার আর বাঁচ্‌বার উপায় নাই।"

শান্তি ভীত হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"সে আশা দুরাশা, জীবন থাক্‌তে আমার এ দেহ তোমার অধিকারে আস্‌বে না।"

মণীন্দ্রের চক্ষের উপর দিয়া যেন জগৎটা হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইল। সে কোন দিকে না চাহিয়া শান্তির হাত ধরিতে অগ্রসর হইল। পিছনেই নদী, সে জ্ঞান তখন তাহাদের ছিল না। কালের বিচিত্র নিয়মে সংসারের দৈত্যদানবের প্রচণ্ড নর্ত্তনে আশ্রয়হীনা শান্তিলতা একমুহূর্ত্তে নদী-গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। মণীন্দ্রও সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, সেও নদীগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটী মানুষ কোথা হইতে আসিয়া নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কেহ দেখিল না—নদীর আলোড়নের সেই গভীর আর্ত্তনাদও কেহ শুনিল না।

কেহ না দেখুক বা কেহ না শুনুক—বিশ্বপ্রকৃতি সজাগ থাকিয়াই দেখিতেছিলেন—শচীন্দ্র একখানা নির্জ্জীব মেঘাভ্যন্তর-লীন-সৌদামিনী-দীপ্তিকে টানিয়া আনিয়া তটের উপর স্থাপন করিল।

মাস খানেকের পরে গ্রামের লোক সেই নদীতটে স্নান করিতে আসিয়া দেখিল যে—একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"বিসর্জ্জন।"

সোমদেব।

মগধের সন্নিকটে কুসুমপুর অতি সমৃদ্ধ নগর। ঐ নগরের প্রান্তদেশ দিয়া বিশালকায়া গঙ্গা খরস্রোতে প্রবাহমান। এই গঙ্গার উপর সারি সারি বজরা, অনন্ত পণ্যবাহী বড় বড় নৌকা, বড় বড় পোতসমূহ লোকসমাকীর্ণ হইয়া মহাকোলাহলের তরঙ্গ তুলিতেছিল। তীরেও সেইরূপ লোকারণ্য। সেই লোকারণ্যের মধ্য দিয়াও নগরের সাজসজ্জাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। তীরের উপরিস্থ সুরম্য শ্রেষ্ঠিবর্গের হর্ম্ম্যশ্রেণীও নানারূপ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া কাহার যেন অভ্যর্থনার জন্য মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। তখন সন্ধ্যার প্রথম আরম্ভস্বরূপ তীরের উপরিস্থ মঙ্গল বাদ্যের ক্ষীণস্বরও ক্বচিৎ শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

এমন সময়ে অদূরে নদীগর্ভে তূর্য্যধ্বনি দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধ্বনি—সমস্ত কোলাহল মথিত করিয়া ভীমনিনাদে এক-তানে অভ্যর্থনাবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ক্ষণপরেই একখানি বৃহৎ পোত মহাড়ম্বরে তীরে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এবং ক্ষণপরেই নাগরিকগণের জয়োল্লাসের সহিত, সামন্তগণের বিরাট অভ্যর্থনার সহিত এবং বন্দিগণের বন্দনাগীতির সহিত মহামান্য ব্রাহ্মণ সোমদেব তীরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত, মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, গমন মন্থর। পরিধানে ব্রাহ্মণোচিত গৈরিকবসনের মধ্য দিয়াও যেন ধনৈশ্বর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতে-ছিল। তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সুসজ্জিত গজে আরোহণ-পূর্ব্বক অদূরে একটী প্রাসাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বহির্দেশের

জনস্রোত মন্দীভূত হইয়াছে, অনুগত জনগণের গমনাগমন অল্প হইয়াছে। এ দিকে সন্ধ্যার তিমিরাঞ্চলে দিগ্বধূ ম্লান হইয়াও দীপবৃক্ষের আলোকপুঞ্জে কৃত্রিম হাস্যের লহর তুলিয়াছেন।

ঠিক এই সময়ে সোমদেব একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে একটী বহুমূল্য পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সম্মুখে পুত্র বসুদেব পিতার পদপ্রান্তে কি যেন ভাবিয়া বসিয়াছিল। ক্ষণপরে পিতা বলিলেন—' পুত্র ! তুমি মহাপরাধ করিয়াছ—কেন তুমি রাজপুত্র সুরথের সহিত শ্রাবস্তীদেশে যাও নাই ?"

পুত্র পিতার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া যেন দৃষ্টি বিনত করিয়া বলিল—"সেনাপতি নিষেধ করিয়াছিলেন।"

সোমদেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সেনাপতি—পুষ্যমিত্র নিষেধ করিয়াছিলেন ?"

পুত্র। "হাঁ পিতঃ ! তিনিই আমাকে লইয়া বিদর্ভদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে মাধবসেনকে পরাজিত করিয়া স্বপুত্র অগ্নিমিত্রের উপর রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং আমাকে তাঁহার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—এ সব কথা কি সেনাপতি আপনাকে বলেন নাই ?"

সোমদেব কি যেন চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন—"কিন্তু তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া—মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া কিরূপে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে—তাহাই আমি ভাবিয়া পাইতেছি না।"

বসুদেব পিতার কথায় একটু ভীত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার বলা হইল না। পার্শ্বের দীর্ঘদ্বারের নীল যবনিকা উত্তোলন করিয়া একটী অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী সেখানে প্রবেশ করিল। যুবতীর আগমনে গৃহগাত্রের স্ফটিকাভ্যন্তরস্থ আলোকপুঞ্জ যেন ম্লান হইয়া

গেল। গৃহে যেন একটী দামিনীমালার লহরীলীলা খেলিয়া গেল। প্রখর রূপের সঙ্গে নানা অলঙ্কারের নানা ভূষণের সমাবেশে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী একটী দিব্য রমণীর মতই তাহাকে দেখাইতেছিল। রমণী সোমদেবের ক্ষত্রিয়া স্ত্রী। নাম—মদয়ন্তী।

মদয়ন্তীকে দেখিয়া সোমদেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু হাঁসিলেন মাত্র। মদয়ন্তী বলিল—"শুনিয়া সুখী হইলাম—আপনি আপনার এ দাসত্বের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ?"

সোমদেব ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন—"এ দাসত্ব,—কোন্ দাসত্ব ?"

মদয়ন্তী—"আপনি বুঝিয়াও কি বুঝিতেছেন না ? কেন আপনি অখণ্ড শাসনদণ্ড হাতে পাইয়াও সেনাপতির অধীন ? কেনই বা ভীরু কাপুরুষের মত আপন ঐশ্বর্য্যে শ্রদ্ধাহীন ? এ উপেক্ষা কি আপনাকে দাসত্বে পরিণত করে নাই ?"

সোমদেব হাসিয়া বলিলেন—"মদয়ন্তী! ভুলিয়া যাইতেছ, আমি ব্রাহ্মণ। আমার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন ? আমার প্রভূত রত্নেরই বা কি প্রয়োজন ?"

মদয়ন্তী হাসিয়া বলিল,—"ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের এরূপ কথা সাজে বটে,—কিন্তু আপনার কথা অন্যরূপ। রাজকার্য্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি খাটে না, ভোগের সঙ্গে ত্যাগের মিলন হয় না। আপনি ভোগী হইয়া নানাকথায় ভুলাইয়া আমায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তখনকার সুখস্বপ্নের কথা কি মনে নাই ? ভবিষ্যতের উজ্জ্বলপন্থার কথাও কি মনে নাই ?" অভিমানে মদয়ন্তীর নয়নকোণে ক্ষুদ্র জলবিন্দু ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল।

সোমদেব অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে লুপ্তস্মৃতিগুলি জ্বলন্ত অক্ষরে আবার ভাসিয়া উঠিল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি ধীরে ধীরে উন্নতির পর উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা

মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্যমিত্রের বিপুল সম্মান ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি ত তাহার দাস। রাজ্যে সেই প্রভু, তিনি তবে কে? পুষ্যমিত্রের অভীষ্ট পূরণে তিনিই না একজন সহায়? সোমদেব পর্য্যঙ্ক ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে একবার প্রকোষ্ঠের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার আজ ভাবনার শেষ নাই। তিনিই আজ স্বহস্তে পুষ্যমিত্রের গলে বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়া আসিয়াছেন—তিনিই ত পুষ্যমিত্রের অভিপ্রায়ানুসারে তাহার প্রভুত্ব খ্যাপনজন্যই মগধে বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র উচ্চ, তিনি হীন - কেন? সোমদেব বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"বসুদেব! আমার আদেশ ব্যতীত অগ্নিমিত্রের দাসত্ব করিতে পারিবে না। আজ হইতে পুষ্যমিত্রের কন্যার পাণিপীড়নের আশাও ত্যাগ করিতে হইবে?"

(২)

ক্রীড়াকাননের কুঞ্জশ্রেণীর উপর দিয়া বসন্তবায়ু রহিয়া রহিয়া বহিতেছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুঞ্জশ্রেণীর অন্তরালে মাধবীলতা হেলিয়া দুলিয়া কাহাকে যেন আহ্বান করিতেছিল। কৃত্রিম ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসধারা কুঞ্জের পাদদেশে বিধৌত করিয়া কৃত্রিম খাতজলে কুলুরবে ঢলিয়া পড়িতেছিল। নানাকুসুমভারে নত হইয়া বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ কাহার কোমল সোহাগ পাইবার জন্য যেন শাখাগ্রভাগ আগাইয়া দিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। প্রকৃতির কোমলতার সঙ্গে অন্তরেও যেন একটা প্রীতিস্ফুরিত আকাঙ্ক্ষার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে মন্ত্রিপুত্র বসুদেব একটী প্রোদ্ভিন্নযৌবনা রমণীর সহিত চিত্রিত

স্ফটিকমঞ্চে বসিয়া বিভিন্ন দিকে কি যেন দেখিতেছিল। রমণী পুষ্য-মিত্রের কন্যা—রঙ্গবতী।

ক্ষণপরে বসুদেব তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"রঙ্গবতি! তবে উপায় কি?"

রঙ্গবতী বলিল—"কি বলিব,—আমার পিতার চরিত্র ত জান? আর কোন আশা নাই।" কিশোরী আর কিছু বলিল না, নিবারিত-নিমেষ দৃষ্টিতে সুদূর প্রান্তে চাহিয়া রহিলমাত্র। তাহার মনের মধ্যে যে একটা হতাশামিশ্রিত করুণ-রাগিণীর উদ্বেল তরঙ্গ বহিতেছিল—তাহা বসুদেবের মনেও উছলিয়া পড়িতেছিল।

উভয়ে শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া স্নেহে প্রেমে বর্দ্ধিত হইয়া আজ এত বড় হইয়া পড়িয়াছে। কত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহারা তাহাদের ভবিষ্যতের দীর্ঘজীবন কত সোহাগের স্বর্ণহারে বিমণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু আজ বুঝি এক প্রকাণ্ড ঝড়ে তাহাদের সেই স্বর্ণহার ছিন্ন হইয়া যায়। পুষ্যমিত্র ক্ষত্রিয়, সোমদেব ব্রাহ্মণ। তখনকার কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-কন্যা বিবাহ করিতে পারিত; কিন্তু অগ্রে ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ না করিয়া ক্ষত্রিয়ার বিবাহে অধিকার ছিল না। পুষ্যমিত্র কন্যাকে সপত্নীর হাতে সঁপিয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, ইহা প্রকাশ। সোমদেবও শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তথাপি তিনি পুষ্যমিত্রের কন্যার সহিত স্বপুত্রের অবাধ মিলনে কোন বাধা দেন নাই। ভাবিয়াছিলেন—কালে হয়ত পুষ্যমিত্রের মতের পরিবর্ত্তনও হইতে পারে।

বসুদেব একটী পুষ্পবৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া বলিল—"তবে রঙ্গবতি! তুমিও কি এ হতভাগ্যকে ভুলিবে?"

রঙ্গবতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমরা পুরুষ,

রমণীর হৃদয় ব্যথা বুঝিবে না!" রঙ্গবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে আসিয়া বসুদেবের হাতখানি ধরিল। বসুদেব সে কুসুমস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে রঙ্গবতী কি যেন বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু তাহারে বলা হইল না। হঠাৎ যামাতীতের দামামাধ্বনি—দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠিল।

রঙ্গবতী চকিত হইয়া বলিল,—"বসুদেব আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে জানি না—কপালে কি আছে।" সৌদামিনী-দীপ্তির মতই সে বসুদেবের অন্তঃকরণ ক্ষণেক উজ্জ্বল করিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। এই দীপ্তিটুকুই—এই চকিতচপলা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা টুকুই স্মৃতিমধ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া রহিলমাত্র।

( )

উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে একটী সুন্দর উদ্যান আলোকমালাসজ্জিত হইয়া কাহার যেন অভ্যর্থনা করিতেছিল। দীপবৃক্ষের চারিদিকে ছোট ছোট লতাগৃহে এক একখানি মনোহর মহার্ঘ্য আসন বিস্তৃত ছিল। আসনের পার্শ্বেই পুষ্পাধার। পুষ্পাধারের সম্মুখ দিয়া শোভাময় পথগুলি কোথাও সরল, কোথাও বক্র, কোথাও মণ্ডলাকার, কোথাও বা চতুষ্কোণভাবে সজ্জিত হইয়া একটা বড় প্রাসাদের দ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সেই উদ্যানেরই একটী লতাগৃহে সেনাপতিপুত্র অগ্নিমিত্র উজ্জয়িনী-রাজ বীরসেনের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন।

বীরসেন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"সম্রাট্‌পুত্র কাল এখানে আসিবেন?"

"আসিবেন বই কি ? স্পর্দ্ধা কম নয়, আমার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়াই আসিতেছেন। শূদ্র হইয়া—ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহের সাধ—এ সাধ অচিরেই—উন্মূলিত হইবে। অগ্নিমিত্রের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া—উঠিল।

বীরসেন চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'আমার পুত্রের সহিত যে কন্যার সম্বন্ধ হইতেছে—আপনার সেই ভগিনীর সহিত ?"

"আপনি স্থির হউন—শূদ্রের ঘরে আর ক্ষত্রিয় কন্যা দিবে না" তাহার এই আস্পর্দ্ধার প্রতিশোধ অচিরেই পাইবে। আপনি প্রস্তুত ?"

"হাঁ।"

"মন্ত্রী সোমদেবকে দ্বার করিয়া আমাদের অভ্যুত্থানের অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইবে। এই যজ্ঞাগ্নিতেই এই দুর্ব্বল পাপিষ্ঠ শূদ্রবংশের পরিসমাপ্তি ও আপনার মত রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা। আর আমার ভগিনীই ভবিষ্যতে আপনার পুত্রের সহিত এই সিংহাসনের অধিকারিণী। কেমন সমস্ত ঠিক ?"

"ঠিক।"

বীরসেন উঠিয়া অগ্নিমিত্রকে লইয়া অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের চক্ষে রোষাগ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিতেছিল।

অন্তঃপুরের একটী প্রকোষ্ঠ অতি মনোহর শোভায় সজ্জিত। সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার অপসারণ করিয়া অগ্নিমিত্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গৃহ মধ্যে বীরসেনের কন্যা চিত্রাবতী বহুমূল্য বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছিল। অগ্নিমিত্রকে দেখিয়া চিত্রাবতী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পার্শ্বের আসন ছাড়িয়া দিল। অগ্নিমিত্র বলিল—"চিত্রা! তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি ? হয় ত কালই আমাদিগকে সমরে নামিতে হইবে।"

চিত্রাবতীর চক্ষুর্দ্বয় জলভারপীড়িত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বসনাঞ্চলে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠেই বলিল—"ক্ষমা করুন—সেনাপতিপুত্র! আপনাদের উদ্যোগ বৃথাই হইবে?" "কেন বৃথা হইবে চিত্রা?"

চিত্রাবতী বলিল—"দাদার সঙ্গে আপনার ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে না। আমি আজ ভগবান্ কালমাধবের মন্দিরে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম—অন্তর যাহাতে উৎফুল্ল না হইয়া উঠে, সেখানে বিবাহে সংসারটা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়!"

"কেন চিত্রা, রঙ্গবতী কি সিদ্ধসেনকে ভালবাসিতে পারিবে না? তুমি ভুল বুঝিয়াছ!"

"ভুল বুঝি নাই—তাহাকে কিছু বলিও নাই—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—সেখানে অন্যের স্বর্ণসিংহাসন উজ্জ্বল শোভায় স্থাপিত আছে, সেই সিংহাসনে অন্যকে বসাইতে চেষ্টা করিবেন না।"

অগ্নিমিত্র রোষরক্তিম চক্ষে একবার ভ্রূকুটি করিলমাত্র। পরক্ষণে চিত্রাবতীর হস্ত ধরিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল—"শোন চিত্রাবতি যে! কাজে নামিয়াছি—তাহা হইতে ফিরিবার উপায় নাই। দুইদিনেই রঙ্গবতীর হৃদয়ক্ষত শুখাইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলিবে না ত?"

চিত্রাবতী একটী নিশ্বাস ফেলিয়া—ঈষৎ কোপ-কটাক্ষে ভ্রূবয় কুঞ্চিত করিয়া চহিয়া দেখিল—অগ্নিমিত্র হাসিতেছে।

(৪)

উজ্জয়িনীর শিপ্রাতীরে ভগবান্ কালমাধবের মন্দিরে প্রাভাতিক মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। শিপ্রাতীর ব্রাহ্মণমণ্ডলীর বেদধ্বনি নিনাদিত হইয়া

মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আর পুরস্ত্রীগণের হর্ষোৎফুল্ল কলকণ্ঠধ্বনিতে মন্দিরের পথও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আজ বসন্তের চতুর্দ্দশী তিথি, কালমাধবের বিরাট উৎসবের দিন। নানা দেশ হইতে উজ্জয়িনীতে জনসমাগম হইয়াছে। কালমাধবের মন্দিরের অদূরে তাঁহার পুষ্পোদ্যান আজ মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত। সেই পুষ্পোদ্যানের একটী কুঞ্জকুটীরে একটী সুন্দর যুবা ও একটী নবীনা উপবিষ্ট। যুবার পরিচ্ছদের পারিপাট্যে রাজবংশের চিহ্ন প্রকটিত হইতেছিল। যুবতীও ঐশ্বর্য মগ্না। তবে নিপুণ দর্শকের চক্ষে সে ঐশ্বর্যের মধ্যেও ত্রুটি লক্ষিত হইবে। তাহাতে প্রাণের অভাবও অনুভূত হইবে। প্রাণের সঙ্গে যেখানে স্ফূর্ত্তির সমাবেশ থাকে—সেখানেই বাহ্য সৌন্দর্য্যও ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

যুবক বলিল—"রঙ্গবতি! অনেক দিন তোমায় দেখি নাই, আশা করি তদাকার আমার ব্যবহারে তুমি ক্ষুণ্ণ হও নাই?"

রঙ্গবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আপনারা আমাদের রক্ষক ও পালক—আপনাদের মুখে ও কথা শোভা পায় না।"

যুবক হাসিয়া বলিল,—"সত্য কথা, কিন্তু আমি তোমার সেইরূপ রক্ষকই হইতে চাই, যাহাতে তোমার প্রতি আর কাহারও অধিকার থাকিবে না। বল বল—ইহাতে তোমার সম্মতি আছে?"

রঙ্গবতী একটী ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আপনি যে উদ্দেশ্যে একথা বলিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য আপনার পক্ষে অনুকূল কি না—জানিনা; কিন্তু উহা—আমার পক্ষে অনুকূল নহে। জানি না—আমি কোথায় ভাসিয়া যাইব।"

যুবক ব্যগ্রভাবে বলিল,—"তোমার অনুকূল নহে ?"

রঙ্গবতী ক্ষণৈক চুপ করিয়া রহিল—পরে ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি আমাদের পালক, রক্ষক ও বন্ধু। বিশেষতঃ আমার ভবিষ্য জীবনেরও সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠাতা, এক কথার আপনি আমাদের—"

পার্শ্ব হইতে ভীমকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"সর্ব্বস্ব"। বিস্রস্তবস্ত্রে শিথিলকলেবরে—বিবর্ণবদনে বসুদেব সেখানে প্রবেশ করিল। বিকৃত-কণ্ঠে আবার বলিল—"হায় রঙ্গবতি! একের দ্বারাও তোমার ক্ষুধা মিটিল না ?"

সম্রাটপুত্র রুষ্টস্বরে কহিলেন—"এখানে তোমাকে কে আসিতে বলিল ?"

বসুদেব দীপ্তচক্ষে কহিল—"কেহ বলে নাই,—কিন্তু দেখিতে আসিয়াছিলাম—দ্বিচারিণী কেমন করিয়া মগধেশ্বরী হয় ?" বসুদেবের হৃদয়ে সংযমের কোন বাঁধই ছিল না, হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসে সবই ভাসিয়া যায়। অসমীক্ষ্যকারিতার ইহাই ফল।

আর রঙ্গবতী ! এই অশনিপতনে—এই বিবেক-বিমূঢ়তায় স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার শরীর অপমানে অভিমানে কম্পিত হইতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সেখানে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

বসুদেব আর কিছু বলিল না, অতীতের প্রভাসসমুজ্জ্বল স্মৃতিকে ষ্ট করিয়া—অর্দ্ধ বিকসিত পারিজাত কুসুম পদদলিত করিয়া হৃদয়ের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলি সামান্য এক কথায় অতল জলে ডুবাইয়া—অন্তর্হিত হইল। সম্রাটপুত্র কেবল সেই অঙ্গলতিকার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল মাত্র।

(৫)

মগধের রাজ-সভায় সোমদেব সম্রাট্ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছেন। জনকয়েক চক্রীর চক্রান্তে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। তিনিই না কি সম্রাটের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া অগ্নিমিত্রের বিদর্ভসিংহাসনে আরোহণের সহায়তা করিয়াছেন। পুষ্যমিত্রও এই অভিযোগের মূলে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। মহামাত্য উদ্ভ্রান্ত-চিত্তে-খিন্ন হৃদয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

পুত্র বলিল—"পিতঃ, প্রতিশোধ চাই?"

স্ত্রী মদয়ন্তী বলিল—"স্বামিন্, প্রতিশোধ চাই।"

মহামাত্যের হৃদয়েও সেই কথা বাজিয়া উঠিল, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বীরোচিত বেশভূষায় ব্রাহ্মণের ত্যাগোজ্জ্বল মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিলেন। কবচ, শিরস্ত্রাণ ও তরবারি ধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মগধে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। সোমদেব কতকগুলি সামন্ত নরপতির সহিত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। সম্রাটের পক্ষে পুষ্যমিত্র সোমদেবের বলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিতরে অন্য আয়োজন চলিতে লাগিল।

কুসুমপুরের অদূরে যুদ্ধক্ষেত্র। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বিরাম হইয়াছে। রণক্ষেত্র নিস্তব্ধ। সেই সন্ধ্যাবিস্ফুরিত প্রকৃতির শ্যামলক্রোড়ে কেহ বা চিরনিদ্রার নিদ্রিত, কেহ বা নিদ্রার অপেক্ষায় তখনও জাগরূক। বসুদেব গঙ্গার তীরে বসিয়া করলগ্নকপোলে কি ভাবিতে ছিল। সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা তরঙ্গহিল্লোলে কত যেন অতীতের ভাষা গাহিয়া যাইতেছিল,—বসুদেব তাহা শুনিতে পাইতেছিল না।

এমন সময়ে একটী যুবক আসিয়া বসুদেবের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পরিধানে সুন্দর বীরোচিত পরিচ্ছদ, কটিতে তরবারি, মস্তকে উষ্ণীষ। সে ক্ষণৈক বসুদেবের দিকে চাহিয়া কর্কশকণ্ঠে ডাকিল—"বসুদেব!"

বসুদেব চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—ক্ষণপরেই তাহাকে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"সাবধান সিদ্ধসেন! আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না।"

সিদ্ধসেন ক্ষিপ্ত হইয়া রক্তিম চক্ষে বলিল—"রঙ্গবতী কোথায়?"

রঙ্গবতীর সম্পর্ক বসুদেব ত অনেকদিনই ত্যাগ করিয়াছে, তথাপি এই আগন্তুকের অযাচিত প্রশ্নে সে বিস্মিত হইয়া তেমনি উচ্চস্বরেই বলিল,—"নারীর কথা এ সময়ে ভাল শুনায় না সিদ্ধসেন! যদি অন্য কোন প্রয়োজন থাকে বলিতে পার।"

সিদ্ধসেনও রঙ্গবতীকে দেখিয়া পাগল হইয়াছে। রঙ্গবতীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত সে কেবল তাহাকে ভাবিয়াছে, তাহার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাহার জীবনী অনুসন্ধান করিয়াছে, শেষে পাইয়াছে অফুরন্ত জ্বালা। সেই জ্বালার প্রভাবেই সে এক্ষণে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। সে বসুদেবের কথায় উত্তেজিত হইয়া বলিল—অন্য প্রয়োজন নাই—রঙ্গবতীকেই চাই। পাপিষ্ঠ! বল্ তাহাকে কোথায় সরাইয়াছিস্?"

বসুদেব জ্ঞানশূন্য হইয়া তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। সিদ্ধসেনও প্রস্তুত ছিল। তখন উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

দূরে নারীকণ্ঠে শ্রুত হইল—"বীরদ্বয়! আত্মনাশ করিও না।" উভয়েই

বিরত হইয়া চাহিয়া দেখিল—একটী প্রোদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী তাহাদের নিকটে আসিতেছে,—কিশোরী চিত্রাবতী।

চিত্রাবতী ভ্রাতার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"এ কি করিতেছ দাদা ? ছিঃ ! সামান্য নারীর জন্য এই আত্মনাশ !"

সিদ্ধসেন ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া বলিল——"তুই কেন এখানে আসিলি ?"

চিত্রাবতী হাসিয়া বলিল—"তোমাদের জন্য রঙ্গবতী ত গৃহত্যাগ করিয়াছে ; তোমরাও মরিতে বসিয়াছ। আমি তাহা সহ্য করিতে পারি নাই বলিয়াই আসিয়াছি। যাইব কি ?"

সিদ্ধসেন বিস্মিত হইয়া বলিল—"রঙ্গবতী গৃহত্যাগ করিয়াছে ! কেহ তাহাকে হরণ করে নাই ?"

চিত্রা। "না।"

বসুদেব নদীর তটে বসিয়া পড়িয়া করলগ্নকপোলে জলস্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র। চক্ষুর সেই দৃষ্টিপ্রবাহপথে কোন পদার্থই তাহার ভাসিতেছিল কিনা সন্দেহ। ক্ষণপরে সেই বড় বড় চক্ষু হইতে মুক্ত জলস্রোতে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল।

(৬)

সে দিন ভীম যুদ্ধের অবসানে সকলে যখন বিশ্রাম সুখের আশায়—ইতস্তত ধাবিত। যখন অনেক রক্তক্ষয় করিয়া—দুই দলই অবসন্ন—তখনকার সেই—রক্ত বিচ্ছুরিত রণপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া—বসুদেব একটী কাননে কি মনে করিয়া যাইয়া—একটা শিলার উপর উপবিষ্ট হইল। সম্মুখে—ভীষণঅরণ্যশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে আরও ভীষণ হইয়া—যেন

একটা মস্ত গাম্ভীর্য্যের তরঙ্গ তুলিতেছিল। সেই গাম্ভীর্য্যের ক্রোড়ে আত্মসত্তা বিসর্জ্জন দিয়া—বসুদেব ভাবিতে লাগিল। আপনার বুদ্ধির দোষে সে যে রত্নকে অবহেলা করিয়া—পিষ্ট করিয়া—সামান্য বালুকা-কণার ন্যায় দূরে ফেলিয়া দিয়াছে—আজ তাহাকে ত পাইবার উপায় নাই। অথচ—তাহারই জন্য সে যে যুদ্ধ ঘটাইয়াছে তাহার মূল ভিত্তি যে কম্পমান! ফল কি! এই শোণিতরঙ্গের অবসানে কেবল অখণ্ড প্রাণহীন—শূন্যতাই কি লাভ হইবে? হায় রঙ্গবতি! না জানি তুমি আমারই দোষে—আমারই অযতনে অভিমানে—গৃহত্যাগ করিয়া—কোন অনির্দ্দেশ্য স্থানে—অরুন্তুদ জ্বালা লইয়া—অপরিসীম তৃষ্ণা লইয়া—আর আমার উপর দুর্ব্বহ ঘৃণার অভিসম্পাত লইয়া অপেক্ষা করিতেছে! অপেক্ষা কর—তোমার সাক্ষাতের জন্য—তোমার পদতলে এই ঘৃণ্য জীবন উৎসর্গের জন্য আমি যাইবই যাইব। যদি এ জীবনে না পারি, অনন্তকাল আছে—অনন্ত জীবন আছে—এই ক্ষণভঙ্গুর—বুদ্বুদের মত জীবনকে আজই এই—রণ-সমুদ্রের তরঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়া—তোমার সঙ্গে—সেই অনন্তের পর পারে যাইয়াই মিশিব। বসুদেব দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চক্ষের ভিতর যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ আসিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

এমন সময়ে কে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিল। বসুদেব চাহিয়া দেখিল—একটী রমণী। রমণী মদয়ন্তী—তাহার জননী। তিনি মুখে হস্তার্পণ করিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বসুদেব বিস্ময়ের আতিশয্যে মুহ্যমান হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

সম্মুখে একটী কানন—কাননের অভ্যন্তরে একটী কুটীরে সেই রমণী

প্রবিষ্ট হইল। বসুদেবও প্রবেশ করিল। তখন সে বলিল,—"মা! এ আমায় কোথায় আনিলে?"

মদয়ন্তী বলিলেন—"পুত্র! তুমি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ,—বল—আজ তাহার সংশোধন করিবে?"

"অন্যায় কার্য্য করিয়াছি?"

"হাঁ—তুমি নিষ্ঠুর হইয়া কোন বিবেচনা না করিয়া একটী রমণী হৃদয়ে যে আঘাত দিয়াছ; তাহার শেষ ফল কি ফলিয়াছে—তাহা যেমন এক দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছ, অদ্য অন্যত্রও তাহার আর একরূপ এখনিই দেখিতে পাইবে। আমার সঙ্গে এস।"

বসুদেবের আশ্চর্য্যের সীমা ছিল না, বিমাতার কথায় ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিল। প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটী সুন্দর শয্যায় একটী রমণী শায়িত ছিল। রমণীর সে পূর্ব্বলাবণ্য কিছু ছিল না। তথাপি তাহাকে দেখিলে যে একটী অপূর্ব্ব দিব্য রমণী বলিয়াই প্রতীত হইবে—ইহাতে সন্দেহের কিছু ছিল না। বসুদেব দেখিয়াই চিনিতে পারিল,—রমণী রঙ্গবতী। বাসুদেবেরই অত্যাচারে সে আজ এই দশাপন্ন,—সম্রাটনন্দনের কোপে পড়িয়া দৈববশে মদয়ন্তীর আশ্রয়-প্রাপ্ত। সে অনেক কথা।

বসুদেব তখন ধীরে ধীরে সেই পর্য্যঙ্কের উপর যাইয়া উপবিষ্ট হইল, এবং ধীরে ধীরে সেই রমণীর মস্তকটী ক্রোড়ে লইয়া বসিল। সেই স্পর্শে—সেই চির-পরিচিত কোমল-কান্ত স্পর্শে রমণী নয়ন উন্মীলন করিয়া কি দেখিল? দেখিল যে—তাহারই সেই নিষ্ঠুর নির্ম্মম বাঞ্ছিতই—আজ অযাচিতভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, এবং দরদরিত অশ্রুধারে তাহার

মুখমণ্ডল অভিষিক্ত করিতেছে। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে সেই অশ্রুবিন্দু-গুলি বড় বড় মুক্তার আকার ধারণ করিল।

(৭)

যুদ্ধের গতি ফিরিল। পুষ্যমিত্র-কন্যার দুরবস্থার কথা যখন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। যখন বুঝিলেন—তাঁহারই অর্ব্বাচীনতার জন্য কন্যার অন্তর্ধান। তাঁহারই বুদ্ধির দোষে স্নেহের কন্যা আজ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় মুহ্যমান। তখন তিনি সমস্ত ঘটনাগুলি একে একে ভাবিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিলেন—তিনিই জোর করিয়া সিদ্ধসেনের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া এই দশা ঘটাইয়াছেন। তিনিই বাল্যে কন্যার বিবাহ না দিয়া যৌবনের অবাধ আকাঙ্ক্ষার মূলে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া কন্যাকে বিকৃত করিয়াছেন। আগে কন্যার হৃদয়ে বসুদেবের স্থান করিয়া দিয়া তিনিই শেষে তাহা সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিই অভিমানে সোমদেবের লাঞ্ছনার মূলকারণ হইয়া এই যুদ্ধ ঘটাইয়াছেন। তিনিই ত বীরসেনের সঙ্গে মিশিয়া সোমদেবের নামে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম যুদ্ধের গতি ফিরিল। কন্যার স্নেহ এখন বড় হইয়া পড়িল। কন্যার জীবন চাই, কন্যার সুখ চাই। পুষ্যমিত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর একদিকে ফিরিল। যুদ্ধের গতি ভিন্নমুখী হইল।

অগ্নিমিত্র আসিয়া বলিল—"পিতঃ! আর ছলে প্রয়োজন নাই। শূদ্রের সঙ্গে আর—সম্বন্ধ কি? তাহার জন্যই আমার ভগিনীর এই অন্তর্ধান। না জানি—সেই বা তাহাকে হরণ করিয়া লইয়াছে—কি না?"

পুষ্যমিত্র রুষ্ট হইয়া দীপ্ত-চক্ষে বলিলেন—"তবে উপায়?"

"উপায় আর কি? এই যুদ্ধের গতি রাজধানী অভিমুখে প্রবাহিত হউক। শূদ্রবংশের—শোণিত-প্রবাহে অভিস্নাত হইয়া আজ ভগিনীর উদ্ধার করিব।" অগ্নিমিত্র ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

পুষ্যমিত্র যুদ্ধের শ্বেত-পাতাকা উড়াইয়া ধরিলেন। যুদ্ধ ক্ষণেকের জন্য থামিল।

পুষ্যমিত্র সোমদেবের সহিত মিশিলেন। তাঁহার পায়ে ধরিয়া নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। তারপর আর যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। পুষ্যমিত্র সবলে রাজধানী আক্রমণ করিয়া মৌর্য্যবংশের একদম বিলোপ সাধন করিলেন। রাজহত্যা করিলেন—রাজপুত্র হত্যা করিলেন। সেই কলঙ্কিত করে মগধের সিংহাসনে পুত্রকে অভিষিক্ত করিলেন।

শেষে কন্যার সন্ধান মিলিল। পুষ্যমিত্র শাস্ত্রানুসারে বসুদেবের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নিজের পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

শেষে আবার যুদ্ধ বাধিল। উজ্জয়িনীরাজ বীরসেন—পুষ্যমিত্রের—ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। কোথায় রাজচক্রী হইবার—আশা,—কোথায়—পুষ্যমিত্রের কন্যার সঙ্গে স্বপুত্রের বিবাহের আশা—কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সিদ্ধসেন উন্মত্ত হইয়া—রণতরঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। উজ্জয়িনীর সম্পূর্ণ শাসনভার অগ্নিমিত্রের হাতে পড়িল। অগ্নিমিত্রও শেষে চিত্রাবতীকে বিবাহ করিয়া—উজ্জয়িনীতেই রহিয়া গেলেন।

আর সোমদেব! তিনি পুত্রকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন—"তুমি আমার অবাধ্য সন্তান। তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় হইয়াছ, ব্রাহ্মণের সংযম হারাইয়া রজোগুণের বশীভূত হইয়াছ। কামনার বশে প্রবৃত্তির

অবাধ তাড়নায় তুমিই এই যুদ্ধের কারণ হইয়াছ, তুমিই শেষে এই রাজ-হত্যার পরম্পরা কারণও হইয়াছ। এতদিন তোমাকে কিছু বলি নাই, বলিবার অধিকারও আমার ছিল না, কারণ আমার শিক্ষায়ই তোমার এই অধঃপতন। আজ তোমাকে আমার এই রাজদত্ত কিরীট পরাইয়া আর এই সচিবোচিত অলঙ্কারে সাজাইয়া আমি বিদায় লইতেছি। ব্রাহ্মণের এ রাজৈশ্বর্য্য সাজে না। ব্রাহ্মণের এ বৃত্তিও নহে।"

একে একে সোমদেব নিজের সমস্ত বেশভূষা খুলিয়া ফেলিলেন। একে একে সেই সমস্ত পুত্রকে পরাইলেন। পরে গৈরিক-ভূষণে একমাত্র পরিচ্ছদে সংসার ত্যাগ করিলেন—মদয়ন্তীও স্বামীর অনুগমন করিল। ব্রাহ্মণ্যের জয় হইল।

ভূতলে অতুলনীয়।

(১)

আজ স্বর্গে বিরাট্ সভা বসিয়াছে। নন্দনকানন অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য সমূহ তথায় নীত হইয়াছে। সভার আড়া-ম্বরের সীমা নাই। একটা প্রকাণ্ড গালিচার মধ্যস্থলে ইন্দ্রদেবের সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, তথায় তিনি উপবিষ্ট। তাঁহার আজ শোভার সীমা নাই, হস্তে রাজদণ্ড। পার্শ্বে আর একটী সিংহাসনে ধর্ম্মরাজ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে গজানন বিরাট্ খাতায় হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন, এবং বাঁশের কলমে কি লিখিতেছিলেন। সম্মুখে অগণিত দেবতাবৃন্দ নিস্তব্ধ-ভাবে উপবিষ্ট। পুণ্যফলে স্বর্গবাসী অনেক মানববৃন্দ সেখানে আহূত হইয়াছে। আজ তাহাদের বিচার,—গজানন তাহাদেরই হিসাব দেখিতে-ছিলেন—"কাহাদের স্বর্গবাসের দিন ফুরাইয়াছে।" সেই মানববৃন্দের মধ্যে একটা আবেগাকুল দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছিল। সকলে উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত, মর্ত্তের আশঙ্কিত ভয়ে কাতর।

ধর্ম্মরাজ গণপতির লিখিত হিসাবটী পরীক্ষা করিয়া ইন্দ্রদেবের নিকট দাখিল করিলেন। তাহা দেখিয়া মানববৃন্দর মনের ভিতর একটা অজানা ঝড় বহিয়া গেল। ইন্দ্রদেব ধর্ম্মরাজের সহিত দুই একটা কথা কহিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কতকগুলি মানববৃন্দের স্বর্গবাসের দিন ফুরাইয়াছে বলিয়া —ঘোষণা করিয়া দিলেন। সভায় একটা বিশৃঙ্খলতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটা লোক কিছুতেই যাইতে চায় না, সে বড় গণ্ডগোল বাঁধাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ইন্দ্রদেবের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া আরও কিছু কাল স্বর্গে থাকিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার চক্ষের সন্মুখে যেন মর্ত্তের ভীষণ পাপময় ছবিগুলি আসিয়া একটা ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিতেছিল। মর্ত্তের পূতিগন্ধময় ভাবগুলি, ক্ষুদ্রহৃদয়ের বিকট পাপময় বিকাশগুলি, অস্থায়ী সুখের, বিশাল ক্রন্দনের, আর অসীম ব্যথিতের যন্ত্রণাগুলি সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না, ইহা তাহার চক্ষের জলের ধারা যেন ইন্দ্রদেবের চরণে পতিত হইয়া বলিতেছিল। ইন্দ্রদেব আর থাকিতে পারিলেন না,—বলিলেন,—"আমি কি করিতে পারি? তুমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলে সেইরূপই ফল পাইবে। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিবে পারি যে,—যদি তুমি 'ভূতলে অতুলনীয়' কোন দ্রব্য স্বর্গে আনিতে পার, তবে পুনরায় এখানে আসিতে পারিবে,—নচেৎ নহে।" তখন ঘোরস্বনে স্বর্গের দরজা খুলিয়া গেল, মানব ভূতলে পতিত হইল।

(২)

'ভুতলে অতুলনীয়' দ্রব্য কি হইতে পারে? মানব ভাবিয়া পাইল না। সে ঘুরিতে লাগিল। কতদেশ—কত গ্রাম—কত রাজধানী সে ঘুরিল; কিন্তু বাঞ্ছিত মিলে কই? সে ভাবে—মানবের চক্ষে অতুলনীয় কি? কিসের জন্য পৃথিবীর লোক ছুটাছুটি করে? কোন দ্রব্যের অভিলাষে মানব আপনা আপনি কাটাকাটি করে? কোন পদার্থের জন্য সুন্দর রাজধানী শ্মশান হয়; শ্মশান স্বর্গ হয়? দেশ মরুভূমে পতিত হয়; আর মরুভূমি সুজলা সুফলা সমীরণ-চঞ্চলা হয়?

সে অনেক ভাবিয়া একজন লোকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বলিতে পার কি তুমি! মানব কি চায়? কোন্ দ্রব্য অতুলনীয়?"

সে লোক ক্ষণৈক বিস্মিতলোচনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণস্বরে বলিল,—'তুমি কি বালক নাকি? জাননা মানব অর্থের দাস। অর্থই মানবের চক্ষে অতুলনীয়—অর্থের জন্য মর্ত্তবাসী করিতে পারে না—এমন কাজ নাই।'

তাহার কথা শুনিয়া সে ফুল্ল-চক্ষে—কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অন্তর্হিত হইল—এবং রত্নের যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা অমূল্য—সেই হীরকের পাহাড় লইয়া স্বর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষে আনন্দ, হৃদয়ে উৎসাহ বাহুতে অসীম বল। দ্বারী দ্বার ছাড়িয়া দিল না, বলিল—ইহা 'ভূতলে অতুলনীয়' নহে। মানব হীরক প্রস্তর দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। বিষণ্ণ-চিত্তে চিন্তার গুরুভার লইয়া, নিরাশার তপ্তশ্বাস বহন করিয়া সে আবার ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল,—সেখানে সকলেই সুন্দর, কেহ কুৎসিত নহে। বিশেষতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারী আরও সুন্দরী। কাহারও গঠনে কিছু-মাত্রও খুঁৎ নাই। চরণ, বক্ষঃ, মুখ, নয়ন সমস্তই যেন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—শুধু সৃষ্টি নহে—বিধাতার নূতন সৃষ্টির নবীন অদর্শ। তাহাদের প্রতি কেবল চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে আবার ভয় হয়, পাছে চক্ষুর কঠোর কটাক্ষের আঘাতে গায়ে আঁচড় না লাগে। সে মুগ্ধ হইয়া, স্তম্ভিত হইয়া, হৃদয়ের আশার উদ্বেল লহরী লইয়া ভাবিল—ইহাই বুঝি 'ভূতলেঅতুলনীয়'। বুঝি কেন—নিশ্চয়ই অতুলনীয়। সে রমণীর সৌন্দর্য্য লইয়া স্বর্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিল এবার আর আমায় ফিরিতে হইবে না। কিন্তু দ্বারী সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া

ঘৃণায় চলিয়া গেল,—দ্বার খুলিল না। মানব নিরাশ হইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা লইয়া ফিরিল। বুঝি তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। কিন্তু সে যেন আবার অজানা উৎসাহে অনুজীবিত হইল। কে যেন তাহার শরীরে কোমল করস্পর্শ করিয়া বলিল,—"ভয় কি ?" অন্বেষণ করিয়া দেখ—তোমার অভীষ্ট মিলিবে।

মানব আবার ঘুরিতে লাগিল—ক্রমে সে শ্রেষ্ঠ বীরের বীরত্ব, প্রধান ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, দানশীলের দান, উপকারীর উপকার, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য একে একে সব লইয়া গেল; কিন্তু নিষ্ঠুর দ্বারী ফিরিয়াও চাহিল না।

(৩)

আশা মায়াবিনী কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে। আশা আছে, তাই বুঝি মানব বাঁচিয়া আছে, নিরাশ মানব বুঝি বাঁচিতে পারে না। আশা কোন বেশে, কোন ভাবে কোনরূপে—কখন বা কোন ব্যথিতের ব্যথা, দূর করে, তাহা বুঝা যায় না। আজও সেই নিরাশ মানব নূতন আশায় অনুপ্রাণিত। হৃদয়ে উৎসাহ, চরণে শক্তি মনে প্রভূত আনন্দ লইয়া সে ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবীও অনন্ত,—তাহার ভ্রমণও আজ সেই অনন্তেরই তুল্য। অনন্তের খোঁজে দেহ মন প্রাণ নিয়োজিত না করিলে কি অতুলনীয় মিলে ? মানব ঘুরিতে ঘুরিতে একটী নরক-সদৃশ পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে করুণা নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে ব্যথিতের জুড়াবার স্থান নাই। সে ভাবিল, কত ভদ্রপল্লীতে ঘুরিয়াছি; কিন্তু বাঞ্ছিত মিলে নাই—এখানে মিলিবে কি ? আজ না হয় আমার ভ্রমণ বৃথা হইবে।

ভাবিতে ভাবিতে পূতিগন্ধময়, নরকের জীবন্ত মূর্ত্তির আধার একখানি গৃহে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে কেহ অতি লোভেও যাইতে ইচ্ছা করে না। দেখিল কি,—একটী সুন্দরী বিগত-যৌবনা নারী—জানু পাতিয়া জোড় হস্তে উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার কপোল চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। মুক্তাফল-সদৃশ সেই অশ্রু-বিন্দুগুলি কেহ দেখে নাই কেহ বুঝে নাই, কেহ অনুভব করে নাই। আগন্তুক স্থিরনয়নে অজানা ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল—"কাঁদে কেন?" কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না।

এক দণ্ড পরে সেই নারী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল—ঘরে একটা লোক প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু চাহিয়া দেখিবা-মাত্র সে যে গভীর বিস্ময়ে মগ্ন হইল, তাহা তাহার হস্তপদ ও মুখের ভঙ্গীতে বেশ বুঝা যাইতেছিল।

সেই মানব তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল—"বিস্ময়ের প্রয়োজন নাই, তুমি কাঁদিতেছিলে কেন?"

নারী চক্ষের জল মুছিয়া বলিল,—"আপনি কি জন্য এখানে আসিয়া-ছেন, কেনই বা আমার অশ্রুজলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

মানব। "জানি না কেন জিজ্ঞাসা করিতেছি। কি জন্য এখানে আসিয়াছি তাহা আমি নিজেই বুঝি নাই। কিন্তু তুমি অদ্ভুত মানব! এখানে এ অবস্থায় কেন কাঁদিতেছিলে?"

নারী ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল,—"পাপ সংসারের এ ক্রন্দন বুঝিবার সামর্থ্য নাই। তথাপি আমার পাপের কথা বলিলে মনের ভার অনেকটা কাটিয়া যায়, তাই বলিতেছি—শ্রবণ করুন—আমি উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। যৌবন অবস্থায় বিধাতার অভিশাপে, না না—আমার

পাপে সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলাম, আমি বিধবা হইলাম। তখন আমার নবীন যৌবন। সংসার তখন আমার চক্ষে সৌন্দর্য্যময়, আকাঙ্ক্ষাময়, স্বপ্নময় ছিল। কামনার সংসারে পালিত হইয়া সংযম শিক্ষা করি নাই। মনে যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতাম। কেহ বাধাও দেয় নাই। এমন সময়ে পিতামাতার মৃত্যু হইল। আত্মীয় স্বজন সব হারাইলাম। পাইলাম কেবল,—একটী নরকের কীট—একটী সুন্দর—মনোহর-চর্ম্মে অবৃত মানব-নামধারী জীব-বিশেষ। আর পাইলাম—মনের বিরাট্ কামনা। বাসনার একটানা স্রোতে বুক-ফাটা পিপাসা লইয়া চক্ষু-ভরা সৌন্দর্য্য লইয়া পাপের কোলে ঝাঁপ দিলাম। আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাবিবার অবসর ছিল না, সমাজ তাড়িত হইয়া, সমাজের দিকে বিকট অবজ্ঞার উচ্চ হাসি মুখে করিয়া সদর্পে নিজের ইহ ও পরকালে বিপুল মসী নিক্ষেপ করিয়া পলাইলাম। তখন দিন গুলি আমার চক্ষে স্বপ্নময় ছিল। কি যেন আবেশে—কি যেন গভীর উল্লাসে, কে যেন একখানি কত মনোহর ছবি আমার চক্ষের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। হায় তখন যদি ভাবিতে পারিতাম! নারী কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষণৈক পরে অতি কষ্টে চক্ষুরজল সম্বরণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল—“তারপর আর কি বলিব মহাশয়! আমার এই দুর্দ্দশা, না না—ইহাই আমার প্রকৃতি উন্নতি। সঞ্চয়ের অনুরূপ ফললাভ হয়, কিন্তু যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা ত আমাকে এত ভাল ফল দান করিবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। কারণ এ অবস্থায় না পড়িলে আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না। সমাজ আমার মহদুপকার করিয়াছে আমায় ভগবানের চরণে স্থান দেওয়াইতে পারিয়াছে। কিন্তু সেই বঞ্চক! সেই বিশ্বাসঘাতক!” সেই নরাধম মানব!—বলিতে বলিতে আহার চক্ষু

প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে আবার সেইভাব সামলাইয়া বলিল, —"না না সেই আমার মহদুপকার করিয়াছে—তাহা না হইলে আজ আমি ভগবানকে পাইতাম না। আজ ভগবানকে চিনিয়াছি—আজ বিশ্বাস করিয়াছি—এত পাপ করিলেও ভগবানের দয়া মিলে। তিনি কি মহান্! তাঁহার কি রূপ! কি দয়া! কি আনন্দ! বলিতে বলিতে সে আবার জানু পাতিয়া বসিল, যেন কি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইল, আবার দরদরিত ধারায় অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

মানব সেই চক্ষুর জল লইয়া—অনুতাপমিশ্রিত হৃদয়ের উৎস লইয়া আর সেই ভগবানের করুণাপূর্ণ শান্তির প্রবাহ লইয়া স্বর্গের দ্বারীর নিকট উপস্থিত হইল। মুখের কথা বলিতে হইল না। আজ স্বয়ং ইন্দ্রদেব আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। সেই দ্বার ঘোর-স্বনে প্রতিধ্বনিত হইয়া জগৎকে জানাইয়া দিল—ইহাই "ভূতলে অতুলনীয়।"

অপেক্ষায়।

ঘরের মধ্যে নববিবাহিতা পত্নী মনোরমার পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া সুধীর কি ভাবিতেছিল। তখন রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল বাহিরের বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ দরজা জানালার উপর দিয়া প্রতিহত হইলেও সুধীরের কাণে আসিয়া বাজিতেছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া অন্তঃসারহীন হইতেছিল। দুই চারিটা পতঙ্গও তাহার অঙ্গে আত্মসমর্পণের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

কি ভাবিয়া সুধীর মনোরমাকে বলিল—"তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে মনোরমা! আমি অমৃত ছাড়িয়া সাধ করিয়া মুখে বিষ তুলিয়া ধরিয়াছি! আমার পরিণাম আর বলিয়া কি হইবে?" সুধীরের চক্ষে জল আসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া একবার সেই বড় ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

মনোরমা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"বিবাহ করিয়াছ বলিয়াই যে আমি তোমার দাসী হইব, এ কথা মনেও ভাবিও না। কেন—সুখ দুঃখ তোমার আছে—আমার নাই? আমার যদি তোমার ভাল না লাগে, বস্—খাও দাও থাক,—আমিও আমার সুবিধা অসুবিধা দেখি।" মনোরমা পাশ ফিরিয়া সরিয়া বসিল।

সুধীর স্ত্রীর মুখে এইরূপ কর্কশ হৃদয়হীন কথা শুনিবার জন্ত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাহার আবেগোৎফুল্ল ফাঁকা প্রাণে কি যেন একটা

কাহার রাগিণী বাজিতেছিল। সে যেন সেই রাগিণীর মধুর আলাপ শুনিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এ কি? তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপর দিয়া—তাহার সর্ব্বস্বের উপর দিয়া বিধাতার এ কি পরিহাস? সে মনোরমার বাক্যে ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া বড় রকম একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

কথা হইতেছে এই যে, রামপুরের মনোমোহন বাবুর কন্যা সুরূপার সঙ্গে সুধীরের অনেক দিন হইতে বড় ভাব ছিল। সুধীর যখন বাল্য-কালের সেই নির্দ্দোষ নির্ব্বিকার অবস্থার মধ্য দিয়া হঠাৎ এক দিন কিশোর বয়সের ক্রোড়ে আসিয়া হাজির হইল, তখন সে সুরূপাকে বড়ই মনোহর দেখিল। আরও দেখিল—সুরূপা তাহাকে বড় ভালবাসে। কিশোরবয়সের সেই প্রীতি প্রণয়ের মূলে কেহ তেমন করিয়া প্রতিবাদ না করিলেও সুধীর জানিত না যে, সুরূপার সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্ভাবনা বিধাতার খাতায় জমা হয় নাই। সুধীরের পিতা নিজের কৌলিন্যগর্ব্বের শ্বেত পতাকা ধারণ করিয়া আপনার আভিজাত্যের বিজয়লক্ষ্মীকে মনোমোহনবাবুর সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া অল্পপয়সায় বিসর্জ্জন দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাহার ফলে সুধীর বুঝিয়াছিল—অন্যত্র তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। সুরূপার চিন্তা—সুরূপার প্রণয়—সুরূপার সেই একনিষ্ঠ প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে ঠেলিয়া পিষিয়া অন্যের নিকট আত্মবিসর্জ্জন দিতে হইবে।

কিন্তু এই আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মবিক্রয়টা সুধীরকে এমনি করিয়াই করিতে হইল,—যেখানে তাহার বিনিময়ে শুধু কেবল ক্রন্দন—শুধু কেবল অসীম শূন্যতার রাজত্ব ধূ ধূ করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া তাহাকে দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। সুধীরের জীবনের উপর আজ যে বিধাতার এই দারুণ

অভিসম্পাত বর্ষিত হইল—যাহার ফলে তাহার সেই অফুরন্ত সুখময় প্রণয়োৎফুল্ল হৃদয়টা একদম যেন কোন অন্ধকারময় পাতালগহ্বরে নিহিত হইল। সেখানে যেন সুখের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ,—আনন্দের সঙ্গে চির-বিরোধ, আর শান্তির সঙ্গে—স্বস্তির সঙ্গে মহান্—কেবল বিদায়ের অভিনন্দন। সে আর কিছু বলিল না, সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশটা সেই ভাবেই—তাহার জাগ্রত চক্ষের উপর দিয়াই বহিয়া গেল। প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন সে একবারমাত্র ক্লান্তির আতিশয্যে চক্ষুর্দ্বয় মুদিয়া ফেলিয়াছিল, তখন স্বপ্নে যেন শুনিল,—কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে—"সুধীর! সুধীর!"

সুধীরের নূতন সম্বন্ধী যোগেশ আসিয়া একটা নাড়া দিয়া আপনার অস্তিত্বটা তাহাকে বিশেষ করিয়াই জানাইয়া দিল। সুধীর বলিল—"কি?"

"আর ভাই পারি না,—বউটার জ্বালায় ঘরছাড়া হ'তে হবে দেখ্‌ছি। মেয়েমানুষগুলা না হ'লে সংসারের কাজগুলা হয় না মানি; কিন্তু তাঁ'কে যে হৃদয়ের অধীশ্বরী করে ফুলচন্দনে পূজা কর্‌তে হবে—এর পক্ষপাতী আমি নই।"

অতি দুঃখেও সুধীর হাঁসিয়া উঠিল। বলিল—"হ'য়েছে কি?"

"হবে আর কি? কেবল অশ্রুধারা, আর কি?—জান ত ভাই! কাল আমোদ করতে গিয়েছিলাম, বাড়ীতে থাকিনি—সেই যে সন্ধ্যা হ'তে অভিমান আরম্ভ হ'য়েছে, এখনও তা'র শেষ হয় নি। বল্‌ব কি, সমস্ত রাত্ত ঘুম হয় নি। ভাল বাস্‌বি বাস্, অত ভাল নয়। খাও দাও আমোদ কর—বস্।"

সুধীরের চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অলক্ষ্যে

অশ্রুবারির মুক্ত প্রবাহকে মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল

(২)

যোগেশের বাগানে বসিয়া সুরূপা মালা গাঁথিতেছিল। তখন সন্ধ্যা কাল। সূর্য্যের শেষ কিরণচ্ছটা সুরূপার মুখের উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক করিতেছিল। মুগগাছের দুই একটী ঝরা-ফুল উড়িয়া আসিয়া সুরূপাকে জ্বালাতন করিতেছিল। আর সান্ধ্যবায়ুও তাহার মুক্ত কেশগুচ্ছের উপর মৃদু মন্দ ক্রীড়া করিতে ছাড়িতেছিল না।

যোগেশের স্ত্রী রমা আসিয়া বলিল—"ছিঃ ভাই! আমাকে বলে আস্‌তে হয়! সন্ধ্যাকালে এখানে একলা থাক্‌তে নেই।"

সুরূপা হাঁসিয়া বলিল—"ক্ষতি কি বউ-দি! কেউ ত আর আমাকে খেয়ে ফেল্‌বে না। আর ফেল্লেই বা, বাবার পাঁচটা মেয়ের একটা কম্‌লে—তবু কতকটা ভিটে থাক্‌বে।"

রমা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুরূপার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"সত্যি ভাই! তোর কপালে দেখ্‌ছি সুখ নেই।"

"আছে বই কি।"

রমা বিস্মিত হইয়া বলিল—"সত্য বল্‌বি? তোর কি তবে কোথাও বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়েছে?"

"হ'য়েছে—সে পোড়া কাঠের সঙ্গে, বুঝ্‌লি?"

এই সোজা কয়টী কথার মধ্যে তেমন দুর্ব্বোধ্য কিছু না থাকিলেও রমা কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল। সুরূপার

হস্তচালিত সূতাটার ফুলের মধ্যে প্রবেশনির্গমের মতই তাহার সেই কথাকয়টীও রমার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিল। সে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ় হইয়া বলিল—"ছিঃ ভাই! মেয়েমানুষের ও সব কথা মনেও আন্‌তে নাই। মেয়ে-মানুষকে পৃথ্বীর মতই স্থির, বজ্রের মতই দৃঢ়, আর দুঃখের মধ্যেও সুখের অন্বেষণ ক'রে নিতে হবে। তবেই ত মেয়েমানুষের প্রতিষ্ঠা। সমাজের অবস্থা যতই খারাপ হ'ক্ না কে'ন—তা'বলে মেয়েমানুষকে খারাপ হ'লে চ'লবে না। তা'কে যে মন্দকেও ভাল বাস্‌তে হবে, দুঃখকেও সহ্য ক'রে নিতে হবে। বাপের দুঃখে কাতর না হ'য়ে নিজের মনটা এমনি ক'রেই গড়ে নাও, যা'তে তোমার স্পর্শে রাঙ্‌ও সোনা হয়।"

"বটেই ত বৌ-দি! মেয়েমানুষ বুঝি আর মানুষ নয়! কেন—কি দুঃখে তা'কে সংসারের যত আপদ্ অশান্তি ঘাড়ে ক'রে নিতে হবে?" মনোরমার এই কথাকয়টী শুনিয়া উভয়েই চমকাইয়া উঠিল। কখন্ যে মনোরমা আসিয়া তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল,—তাহা উভয়ে মোটেই টের পায় নাই।

এ সামান্য ব্যাপারটা তাহারা টের পাক্ আর নাই পাক্, কিন্তু পরক্ষণেই একটা মস্তব্যাপার ঘটিয়া গেল। হুড়মুড় করিয়া খিড়কির দরজা খুলিয়া যোগেশ সুধীরকে টানিয়া লইয়া সেখানে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সুরূপার সেই বিস্ময়-বিবর্ণ মুখের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"সুধীর! এর একটা গতি ক'রতে পারিস্? এর বিয়েটা আর না দিলে চলে না।"

সুধীর বিস্মিত-মুগ্ধ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। কিছু বলিল না।

স্বরূপাও সুধীরের এই অসম্ভাবিত আগমন মোটেই আশা করে নাই, সে জন্য সে প্রস্তুত ছিলও না। তাহার মুখখানা যে কখন্ হঠাৎ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

যোগেশ সুধীরের স্বেদস্বিন্ন দেহখানাকে ঠেলা দিয়া বলিল—"বড় বেশী পরিচয় যে হতভাগা!"

সুধীর সে কথার কোন উত্তর দিল না।

যোগেশ তাহার দিকে চাহিয়া হাঁসিয়া বলিল—"পুরুষগুলাও এমন! আমোদ করবি, খাবি, দাবি, বস্—অত প্রেম ভাল নয়!"

সেখানকার মানুষগুলা লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

(৩)

সেদিন অপরাহ্নে মনোমোহনবাবু বিমর্ষবদনে ঘরে বসিয়াছিলেন, নিকটে কেহ ছিল না। বয়স্থা কন্যার বিবাহের ভাবনাই তিনি ভাবিতেছিলেন। দরিদ্রের ঘরে কন্যার জন্মে যে বাপ মায়ের কত ক্লেশের, কত বিপদের—তাহা তাহার শীর্ণ মলিন মুখমণ্ডলের কুঞ্চিত রেখার বড় বড় টানাগুলিই যেন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছিল। এমন সময়ে যোগেশ আসিয়া নমস্কার করিয়া পার্শ্বে বসিল। যোগেশ মনোমোহন বাবুর দূর-সম্পর্কে ভাগিনেয়। চুপ করিয়া থাকা তাহার কুষ্ঠীতে বিধাতাপুরুষ লেখেন নাই। সে বলিল—"মেয়ের বিয়ের কথা ভাব্ছেন বুঝি?"

মনোমোহন বাবু ম্লানহাস্যে বলিলেন—"হ্যাঁ রে! দেশে পুরুষগুলারও কি দুর্ভিক্ষ হ'ল নাকি? সস্তায় কি মোটেই ঐ জিনিষগুলা বিক্রী হয় না?"

যোগেশ চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল—"সেকি মামাবাবু? দেশে রোজ্রবরে

টোপরে—যা হয় একটা ধরে কাজ্‌টা শেষ করে ফেলুন না। দরিদ্র না হয়—দু'টী খেতে পায়—বস্‌।”

যোগেশের কথার ভঙ্গীতে মনোমোহন বাবু—অতি দুঃখেও হাঁসিয়া উঠিলেন। “হ্যাঁ রে! বাপ মায়ে কি শুধু মেয়ের খাওয়াটাই জুটিলে সন্তুষ্ট হয়? আর কিছু দেখ্‌বার নেই? মেয়ের কি সুখদুঃখ বলিয়া কিছু নেই রে?”

যোগেশ বিস্মিত হইয়া উঠিল—“সুখ দুঃখ! অ্যাঁ—খাওয়া দাওয়া ছাড়া আর কি সুখ থাক্‌তে পারে?” এগুলা ছাড়া যে মেয়ে মানুষের আরও একটা মস্ত সুখের আছে; যাহা এগুলা অপেক্ষাও বেশী ভাবিবার জিনিষ—যোগেশ অবশ্যই সে বিষয়টী কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই। সে মাথা নাড়িয়া বলিল—“তাইত মামা! তবে ত সুরূপার বিয়ে,—হ্যাঁ,—সুধীরের সঙ্গে বড় ভাব,—সে হউক,—কি উপায় হবে মামা?”

কি ভাবিয়া যোগেশ এতগুলা কথা বলিল—তাহা তাহার সম্পূর্ণ জানা না থাকিলেও মনোমোহনবাবু কিন্তু অবাক্‌ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুরূপার সম্বন্ধে একটা যে মস্ত ভাবিবার বিষয় আছে—তাহা তাঁহার মোটেই জানা ছিল না। সুধীরের সঙ্গে সুরূপার বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গাটা যে একটা ভয়ানক গুরুতর কিছু হইতে পারে—বয়স্থা কন্যার অন্তঃকরণে যে একটা স্মৃতির দাগ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকিয়া তাহার ভাবী-জীবনকে কালিমাময় করিতে পারে—তাহা তিনি মোটেই ভাবেন নাই। তিনি যোগেশকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

যোগেশও সেখান হইতে উঠিয়া সুরূপার ঘরে প্রবেশ করিল। সুরূপা একখানি খাটের উপর বসিয়া বাঙ্গালা নভেল পড়িতেছিল।

তাহার অবেণীসংবদ্ধ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠের উপর দুলিয়া দুলিয়া কৃষ্ণসর্পের আকার ধারণ করিয়াছিল। বাহিরের রক্তিমরৌদ্রের লুকোচুরি করিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া প্রবেশ করা কিরণগুলি সুরূপার সেই চুলের উপর পড়িয়া প্রেমের খেলা খেলিতেছিল।

যোগেশ ডাকিল—"সুরূপা!"

সুরূপা চমকিয়া উঠিয়া বড় বড় চোখ দুইটী যোগেশের উপর স্থাপন করিয়া চাহিয়া রহিলমাত্র। বসিতে বলিল না বা কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না।

যোগেশ আপনিই বলিল—"তো'দের মনের ভাব বুঝা ভার; তা' তোর মনে যাই থাক্—তো'র বিয়েতে যে দু'টো সন্দেশ খাব, তার ত কোন যোগাড়্ দেখ্ছি না। মামীমা বল্লেন—সুধীর তোর যেখানে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল—সেটা ভেঙ্গে গেছে। এখন কালীঘাট কেমন দেখ্লি বল?"

যোগেশের কথা কয়টী সুরূপার অন্তঃকরণে শেলের মত যাইয়া বিঁধিল। সে সব কথা জানিত না। সুধীরের এত বড় একটা যে তাহাকে লইয়া ভাবনার বিষয় আছে, তাহাও জানিত না। অভিমানে, ক্ষোভে, লজ্জায় তাহার যেন মাটীতে মিশিয়া যাইবার মত অবস্থা হইল। সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল—যোগেশের কথার উত্তর দিল না।

যোগেশ তাহার ভাব দেখিয়া হাঁসিয়া বলিল—

"তা' দুঃখ কর্‌লে কি হবে দিদি! মেয়ে মানুষের অত দুঃখ ভাল—নয়।"

সুরূপা মুখ লাল করিয়া—ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"মেয়ে-মানুষেরও কি তোমাদের মত অন্তঃকরণটাও নেই দাদা?"

"কথাঠিক,—তবে কি জান—মেয়ে মানুষ হচ্ছে সংসারের অসার জিনিষ! হিতোপদেশে আছে—"

সুরূপা হাঁসিয়া ফেলিল—বলিল—"হিতোপদেশের কথা এখন শোন্‌বার দরকার নেই। পুঁথির বিদ্যার সঙ্গে অনেক সময়েই হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না। থাক্‌লে তুমিও রমাকে একবার ভাল করে বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে।"

যোগেশ হাঁসিয়া বলিল—"সত্যি নাকি? হ্যাঁ রে! রমা—কি বড় দুঃখ করে নাকি?"

সুরূপা শান্তস্বরে বলিল—"দুঃখ করে না? তাকে ত কোন দিন চিন্‌লে না!"

যোগেশের মনের মধ্যে রমার সেই জল-ভরা চক্ষু দুইটী হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। রমার সেই ভাসা ভাসা চোখ্ দুইটীর মধ্যেও যে কত ব্যথা, কত দৈন্য, কত প্রাণের আশা অকাঙ্ক্ষার অরুন্তুদ-পিপাসা যে ধারা বহিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহা তাহার চোখের উপর যেন ভাসিয়া উঠিল। রমার মধ্যে এমন করিয়া সে ভাবিবার কিছু পায় নাই। ভাবিয়াও যে সুখ পাওয়া যায়—তাহাও তাহার জানা ছিল না। সে সুরূপার দিকে একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া—আপন মনেই বলিল—"মেয়েমানুষ গুলারও তবে পুরুষকে ভালবেসে—তাহার আদর না পেলে—বড় কষ্ট হয়—অ্যাঁ?"

সুরূপা—শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবটা ক্ষণেকের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া—বলিল—"তুমি বড় নিষ্ঠুর দাদা!"

"সত্যি নাকি? তবে ত বড় অন্যায় হয়েছে! হ্যাঁ—তবে ত তুইও বড় বিপদেই পড়েছিস্। সুধীরকে ছেড়ে পরকে বিয়ে কর্‌তে তবে ত তোর বড় কষ্ট হবে?"

স্বরূপা লজ্জায় আরক্ত হইয়া—রাগিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

সে দিন সন্ধ্যার সময়—ছাদে বসিয়া রমা মনোরমাকে লইয়া গল্প করিতেছিল। অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা রমার সেই ম্লান মুখের পড়িয়া—বড়ই মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। সে নড়িয়া বসিয়া বহিল—"স্বামী কি বস্তু তা' দু'দিন বাদে বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

মনোরমা—রাগিয়া বলিল—"তুমি ত বুঝ্‌তে পার্‌ছ—বৌদি? আমার আর দরকার নেই।" অভিমানে মনোরমার কণ্ঠস্বরও ভারী হইয়া—উঠিয়াছিল। রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমার—দাদার কথা বল্‌চ? হলেনই বা তিনি নারীজাতির প্রতি ঘৃণাশীল—স্ত্রীলোকের—তাতে কি এসে যায়—? আমার কাছে—তিনি দেবতা—আমার কাছে তিনি ত পূজ্য।" রমার—চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মনোরমা—তাহার ভাব দেখিয়া হাঁসিয়া বলিল—"মেয়েমানুষের—কি আলাহিদা সত্ত্বা নেই বৌদি?"

রমা। "যে দিন থেকে—বাপ মা—আমাদিগকে পুরুষের হাতে সঁপে দিয়েছেন,—সেই দিন থেকেই যে পুরুষের সংসার—পুরুষের সমাজ—এবং পুরুষের প্রতি অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা লইয়া আমাদের জীবনটাকে অতিবাহিত কর্‌তে হবে। তা' পুরুষ ভালই হউন আর—মন্দই হউন। মন্দকে ভাল করাই যে আমাদের বড় সৌভাগ্য। তা' ঠাকুরঝি ঠাকুর-জামাইত মন্দ নহেন।"

মনোরমার ও মনে এই রকম একটা কথা বাজিতে ছিল। বাস্তবিকই

ত তাহার স্বামী মন্দ নহেন। এমন রূপ, এমন গুণ, কয়জনেরই বা দেখা যায়! কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর সেই আলাহিদা একনিষ্ঠ আত্মপ্রভাবের কথা মনে করিয়া সে উষ্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—কেন—খোসামোদ কিসের? আমাকেই তাঁহার সেবা করিতে হইবে, আমাকে তাঁহার চরণে যথাসর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিতে হইবে—কেন—আমার কি কোন মর্য্যাদা নাই, আমার কি কোন পাইবার নাই,—আমি কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছি? মনোরমার চক্ষু অভিমানে অহঙ্কারে জ্বলিয়া উঠিল। পুরুষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বা পুরুষের সংসারে—আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি কথার মধ্যে সে কোনই সামাঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু সেই সেদিনকার স্বামীর ভাবটা হঠাৎ তাহার—চখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সুরূপার প্রতি স্বামীর সেই যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি—সুরূপাকে দেখিয়া—স্বামীর সেই যে বিষাদ—ম্লান মুখভঙ্গি—তাহার—মনের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতের সৃষ্টি করিয়া দিল। স্বামী সুরূপাকে ভালবাসে, কেন—? আমার কি রূপ গুণ নাই? চিন্তাসূত্রের এই জটিল পাকে পড়িয়া মনোরমা বড়ই—ক্লান্তি অনুভব করিল। যে আত্মসত্তার প্রতিষ্ঠায় মনোরমা—উদগ্রীব, আজ সমস্ত সুবিধা পাইয়াও সে যেন তাহাতেও বড় অসুবিধা বলিয়াই বোধ করিল। হায় নারীপ্রকৃতি!

বাড়ীর দাসী মঙ্গলা আসিয়া মনোরমাকে শুনাইয়া—রমাকে বলিল—"বউ ঠাকুরুণ! শুনেছ?

"কি রে মঙ্গলা?" রমার স্বরে উৎকণ্ঠা নিহিত ছিল।

মঙ্গলা গালে হাত দিয়া বলিল—"শোননি? তোমার ঠাকুর জামাইয়ের যে আবার বিয়ে গো?"

রমা বিস্মিত হইয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল—"মিথ্যা কথা! তোকে একথা কে বল্লে?"

মঙ্গলা হাঁসিয়া বলিল—"মিথ্যা নয় বৌঠাকরুণ! ও বাড়ীতে শোনগে। সুরূপা দিদির মায়ের যা আনন্দ—তোমায় আর কি বলব।" মনোরমার দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া মঙ্গলা হাঁসিতে হাঁসিতে চলিয়া গেল।

রমা মনোরমার হাতখানি ধরিয়া শান্তকণ্ঠে ডাকিল—"ঠাকুর ঝি?"

সেই কোমল আহ্বানে কোথা হইতে মনোরমার চক্ষে জল আসিয়া হাজির হইল। সে সেই ক্ষুদ্র বিন্দুগুলিকে গড়াইতে না দিয়া জোর করিয়া চক্ষুলাল করিয়া উঠিয়া গেল। তাহার মনের মধ্যে যে সুপ্ত অভিমান বহ্নি ধূমায়িত ছিল—আজ এই কঠোর উত্তেজনার অভিসম্পাতে তাহা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কেন—নারী কি এতই অবজ্ঞেয়? ছার পুরুষ! সে একাই এ জীবনটা হাঁসিয়া খেলিয়া অতিবাহিত করিবে। কিন্তু সেদিনকার রাত্রি মনোরমা যে কাঁদিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহা তাহার সিক্ত উপাধান রমাকে পরদিন স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছিল।

(৫)

সুধীরের পিতা চারুবাবু একরাশি ধূম উদ্গীরণ করিয়া হুঁকাটা পাশে রাখিয়া যোগেশের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"বেঁচে থাক বাবা!—ছেলেটার সংসার নিয়ে আমি বড়ই ভাবনায় পড়েছি। তা তুমি এত টাকা কোথায় পাবে বাবা!"

যোগেশ সোৎসাহে বলিল—"সে জন্য ভাবেবেন না, আমার বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন। কিন্তু আপনার ছেলে না গোল করে।"

"সে ভাবনা ক'র না। হ'লেই বা তার একটা বিয়ে। পুরুষের বহুবিবাহে শাস্ত্রে দোষ লেখা নাই। কি বল বাবা!"

সমস্ত কথাটা ভাল করিয়া তলাইয়া লইয়াও যোগেশের মনটা প্রসন্ন হইল না। সে তখন সেখান হইতে বিদায় লইয়া ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিল।

সে ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল,—রমা মনোরমার এক গোছা চুল লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রমার দিকে একবার চাহিয়া সে সহজ স্বরেই মনোরমাকে বলিল—"সুধীরের যে আবার বিয়ে রে মনোরমা!"

মনোরমা দাদার মুখে এইরূপ শুনিবার প্রত্যাশা করে নাই। সে ঘা খাইয়া রাগিয়া চুলের সেই অসমাপ্ত বেণী লইয়াই পলাইয়া গেল।

রমা রাগিয়া উঠিয়া যোগেশের দিকে চাহিয়া বলিল—"নিজের ভগিনী বলিয়াও কি একটু দয়া নেই তোমার?"

যোগেশ রমার এই মূর্ত্তি কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। রমা যে তাহার মুখের সম্মুখে আসিয়া দৃপ্তা সিংহীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিবে, এটা তাহার ধারণার অতীত ছিল। সে রমার সেই মূর্ত্তিখানাকে অবশ্য কেমন যেন একটু ভাল করিয়া দেখিয়া হাঁসিয়া বলিল—"হ'য়েছে কি? সুধীর ত আর মনোরমাকে ত্যাগ করবে না।"

রমা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—সেখানে কুটিলতা নাই—কোন ছল চাতুরীও নাই। সে তখন মুখখানা নত করিয় মাথার কাপড়টা একটু তুলিয়া দিয়া ধীরস্বরে বলিল—"তোমরা পুরুষ—বিধাতা কি তোমাদের মনে একটুও দয়াধর্ম্ম রাখেন নি? নিজের ভগিনীর দিকেও কি দেখ্তে নেই?"

রমার কথার উত্তরে যোগেশ যে একটা অকস্মাৎ ভয়ানক কথা বলিয়া

ফেলিয়াছে, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। যে কথাটা কিছুদিন গোপন করিবার জন্য তাহার মাথার উপর একটা শপথের ভার চাপান ছিল, তাহা যে এমন করিয়া এক নিমেষে নামিয়া বসিতে পারে, এটা সে ধারণাও করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেটাকে ত ঢাকাও চলে না। সে তাড়াতাড়ি রমার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"কাহাকেও ব'ল না, বুঝ্‌লে! শেষকালে ভাল হবে, চারুবাবু ব'লেছেন—বুঝ্‌লে।"

স্বামীর স্পর্শে রমা শিহরিয়া উঠিল। তাহার বাহেন্দ্রিয়ের উপর যেন অমৃতবৃষ্টি হইতেছিল—তাহার তখন অন্য বিষয়ে ভাবিবার আর অবকাশ ছিল না। স্বামীর মূর্ত্তি—স্বামীর স্পর্শই তখন সজাগ হইয়া তাহার অন্তরেন্দ্রিয়ের ভিতরও একটা গোলমালের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। সে আনন্দোৎফুল্ল প্রাণে উন্মুখ হইয়া একবার স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিলমাত্র।

যোগেশও বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণপরেই রমার হাতখানাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"বাপ্‌ রে! দু'দিনেই দেখ্‌ছি ঘাড়ে চ'ড়বেন। মেয়েমানুষের অত সোহাগ ভাল নয়।"

রমা কথা শুনিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। তাহার আপনার প্রতি বড় ঘৃণা জন্মিল। সে বিমর্ষমনে সেখানে বসিয়া পড়িয়া যোগেশের সেই রূঢ় কথাগুলি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

মনোরমা আসিয়া রমার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল—"কি হবে বৌ-দি!" তাহার কথাকয়টী এমনি শুনাইল যে—যেন তাহার প্রাণের মধ্যে থাকিয়া কে যেন বলিতেছে—আর তোর কোন অবলম্বনের নাই—আর তোর কোন সুখ নাই।

রমা চকিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"ছি ঠাকুরঝি! একটুতে কষ্ট

পেলে চল্‌বে কেন ?” মনোরমা—কেন জানি না চটিয়া উঠিয়া বলিল
—“হুঁ কষ্ট !”

(৬)

সুধীর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। সে দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল। আজ তাহার অনবদ্য রূপ, সুস্থ শরীর, কোমল হৃদয় ও নূতন বয়স—সবে মিলিয়া মিশিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা চায়—কেন তাহা পায় না ? কেন সংসার তাহার বিরুদ্ধে দুরন্ত কঠোর মূর্ত্তি লইয়া ভয়াবহ বিভীষিকার অভিনয়ে আজ উদ্যত ! নূতন যৌবনের নবীন মন্ত্রে যখন সে অনুপ্রাণিত, তখন কেন সংসার তাহাকে সুরূপার ছবি দেখাইয়াছিল। দেখাইয়াছিল ত তাহাকে কেন আপনার করিয়া দিল না ? কেন এই রৌদ্র আঘাতের সৃষ্টি ? তাহার পর তাহার বিবাহ—কই মনে ত পড়ে না ? কত আশা, কত সাধ লইয়া জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্যের অপরিসীম কল্পনায় সে যখন সন্ত্রস্ত—মুগ্ধ—উন্মত্ত ! তখন কেন বিধাতার বিড়ম্বনায় হঠাৎ এক দিনে জগৎটা তাহার চক্ষে মরুভূমি হইয়া গেল ? এ দুর্ব্বহ—আনন্দহীন জীবন ত বহা যায় না ! আরাম চাই ! আনন্দ চাই !! শান্তি চাই !!!

মঙ্গলা আসিয়া চুপি চুপি তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল। সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পত্রখানি খুলিয়া অবাক্‌ হইয়া গেল। পত্রে লেখা ছিল—

“আপনাকে কোন দিন পত্র লিখি নাই। আজ নির্লজ্জার মত আপনাকে লিখিলাম—ক্ষমা করিবেন। আপনি আমার অন্যত্র বিবাহ

সম্বন্ধ করিয়াছিলেন—আমার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য পরিশ্রমও করিয়াছিলেন, শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম। আপনি পুরুষ—যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার বক্তব্য নাই। বিধাতা আমার ভাগ্যে সুখ লেখেন নাই, তাই আজ আমি আপনার নিকট নির্লজ্জা—তাই আজ অনুগ্রহপ্রার্থিনী।

সকলেই আমার বিবাহের পক্ষপাতী। সমাজের খাতিরে আমাকে হয় ত বিবাহ করিতেই হইবে। তথাপি আপনার দিক্ দিয়াও একটা যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও শুনিলাম। আমি বিবাহ করিতে রাজি নহি। এক পাড়ায় থাকিয়া - আপনার স্ত্রী—বিশেষতঃ আমার ভগিনী মনোরমার সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিতে আমার সাধ্য নাই, তাহা ভয়ানক পাপ। আমি আর কিছু চাহি না—অন্ততঃ আপনার দিক্ দিয়া কোনরূপ স্মৃতিচিহ্নও রাখিতে ইচ্ছুক নহি। এই জন্য প্রার্থনা—শীঘ্র বিবাহ বন্ধ করিবেন। নচেৎ অনর্থ ঘটিবে। ইতি—

সুরূপা।"

দুই বার তিন বার করিয়া পত্র পড়িয়াও সুধীর কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার দিক্ দিয়া—সুরূপাকে বিবাহের আয়োজন? সে হতবুদ্ধি হইয়া—বসিয়া পড়িল। সত্য বটে সুরূপার চিন্তা তাহাকে আকুল করিয়াছে, —সত্য বটে,—সুরূপাকে এখনও সে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। কিন্তু একি অভিযোগ? সে ইতস্তত ঘুরিয়া বিছানার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। সুরূপার দিক্ হইতে যে এমন একটি বিপ্লবের অভিঘাত তাহার ঘাড়ের উপর দিয়া বহিয়া যাইবে, তাহা তাহার জানা —ছিল না। তথাপি সে সুরূপার পরিষ্কার—অন্তঃকরণটা এই পত্রের

মধ্য দিয়া দেখিয়া—পুলকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কি যেন একটা অসম্ভব সম্ভাবনায়—সে চমকিত হইয়াও উঠিল।

মনোরমা অসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিল। অকস্মাৎ এই আলোকের উত্তেজনায়—সুধীর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল—মনোরমা আসিয়াছে। মনোরমার সেই সগর্ব্ব অঙ্গ-লতিকার মধ্যেও যেন কি আসিয়াছে। যে অপ্রীতিকর অপূর্ণতার ভারে—মনোরমা পীড়িত ছিল—সেই দুষ্ট ভারটা যেন তাহার ঘাড় হইতে নামিয়া গিয়াছে। মনোরমার সেই লজ্জা-চকিত ব্যবহার,—মনোরমার সেই নম্র—সঙ্কুচিত,—কেমন যেন একটু আকাঙ্ক্ষার ভাব,-মনোরমার সেই প্রেম-পূর্ণ চক্ষুর স্নিগ্ধ মধুর ঔজ্জ্বল্য-টুকুই তাহার চক্ষের সম্মুখে আজ যেন বড় করিয়াই ঠেকিল। সে বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র।

কিন্তু একি? মনোরমা মরমে পীড়িত হইয়া—লজ্জা-জড়িত হইয়া কাহাকে প্রণাম করিতেছে? একি? এ কোমল কর-কিশলয়ের কম্পিত স্পর্শে কেন তাহার গায়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে? একি? মনোরমার চক্ষুতে জল কেন? সুধীর বিস্ময়ের আতিশয্যে ডাকিল—"মনোরমা!"

"মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, উত্তর দিল না। সুধীর আবার ডাকিল—"মনোরমা! ভাল আছ?"

মনোরমার কণ্ঠ হইতে কোন স্বর লহরীরই সৃষ্টি হইল না। সে ঘাড় নাড়িল মাত্র। সুধীর আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু কি একটা মনে করিয়া বলিল,—"শুনলাম সুরূপার বিয়ে হবে, কিন্তু রটালে কে?"

'রটালে কে?' মনোরমার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। নিজে সমস্ত ঠিক করিয়া, কত সাধ করিয়া বিবাহ করিতে চলিয়াছেন,—যত দোষ যে

রটাইয়াছে—তাহার! সে রূঢ়কণ্ঠেই বলিল—"জানিনা।" পরক্ষণেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিবাহের পরে প্রথম আলাপের সময় সুধীর মনোরমার যে দীপ্ত দেহখানিকে দেখিয়াছিল, আজ হঠাৎ সেই ছবিটী তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল। যে মনোরমার মনোহর প্রেমময় হৃদয়টী আজ হঠাৎ তাহার দীনপ্রাণে জাগিয়া উঠিতেছিল—তাহা পরক্ষণেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

(৭)

নবজীবনের প্রথম সূচনার আরম্ভে রমা প্রবল জ্বর করিয়া বসিল। যোগেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়ল। তাহার আর ঠিক সময়ে স্নান, আহার হয় না। তাহার আর হাতের গোড়ায় সমস্ত জিনিষগুলা অসম্ভাবিত উপায়ে হাজির হয় না। তাহার বাবুজীবনের সতর্ক শৃঙ্খলা করিবার সজাগ প্রহরাও আর নাই। সে চিরকালই হাঁসিয়া খেলিয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইয়াছে—অভাব বোধ করে নাই। তাই আজ এই রমার ভীষণ রোগে—সে তাহার অভাবটা বড় করিয়াই বুঝিল। সে একদিন মনোরমাকে বলিল—"দেখিস্ দিদি! রমাকে বাঁচাতে পারবি ত?"

মনোরমা হাঁসিয়া বলিল—"বৌ-দির উপর বড় যে টান?"

যোগেশ ভগিনীর দিকে চাহিয়া একটু হাঁসিয়া বলিল—"তোর বৌ-দিকে না পেলে যে আর চলে না। আমার এই কাজকর্ম্মগুলোই বা করে কে?"

মনোরমা দাদার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিয়া বলিল—"মেয়েমানুষের যত দাসীপনা!, কেন—তোমরা করতে পার না?"

যোগেশ অবাক্ হইয়া মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিল না।

রোগশয্যায় শুইয়াও রমা স্বামীর কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিল। স্বামীর এই অল্প কথাকয়টীর মধ্যে এমন কি মধুর উপভোগ্য সে পাইয়াছিল—জানি না; কিন্তু তাহার নেত্রদ্বয় আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আনন্দের আতিশয্যে তাহার বুকটাও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। স্বামী তাহাকে চান! স্বামীর কাজে সে লাগিয়াছে! যে কারণেই হউক স্বামী তাহার অভাবও বোধ করে—এ সৌভাগ্যও যে রমা অনুভব করে নাই। তাই তাহার এই আনন্দ।

মনোরমা আসিয়া অভিমানভরে রমার পার্শ্বে বসিল। রমা মনোরমার সেই ভাবও যে লক্ষ্য করে নাই—তাহা নহে। সে একটু হাঁসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"রাগ হ'য়েছে বুঝি? তা' ভাই অবুঝ হ'লে চ'লবে কেন? মেয়েমানুষের আত্মত্যাগের কথাটা কি তোমাকে আবার ব'লতে হবে? এই ত্যাগেতেই যে ভাই বড় সুখ। পায় ত সকলেই—কিন্তু সেই পাওয়াতে মেয়ে-মানুষের সতীত্বটা কি ফুটিয়া উঠে ভাই?"

মনোরমার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যেই একটা বিপ্লব চলিতেছিল। তাহার কোমল নারী প্রকৃতির সহিত সংসারের কঠিন আদর্শটার বড়ই বিরোধ বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। সেই বিরোধের উত্তেজনায় যখনই সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, তখনই তাহার অন্তঃকরণে কঠিন ভাবটা সজাগ হইয়া উঠে। আবার পরক্ষণে কেমন একটা অনুকূল হাওয়া পাইলেই তাহার নারীধর্ম্মটা আবার ফুটিয়া উঠে। দাদার সংসর্গে সে যে কঠোরতা পাইয়াছিল, রমার সহিষ্ণুতার সঙ্গে

সঙ্গেই—আর তাহার বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমনি করিয়াই মনোরমার জীবন গঠিত হইয়াছে, এমনি করিয়াই রমার পার্শ্বে বসিয়া আত্মসত্তা বিসর্জ্জন দিতে শিখিয়াছে। রমার সঙ্গী-হীন জীবনে সাহায্যও করিয়াছে, তাই মনোরমা রমার রোগশয্যায় প্রধান অবলম্বন। রমা মনোরমাকে সুধীরের বিবাহ সম্বন্ধে যে মিথ্যা কথাটা উঠিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলে নাই—এই আঘাতটাও মনোরমার জীবনকে কোমল করিয়া তুলিয়াছে।

সে দিন সুধীর আসিয়া রমার অসুখ দেখিয়া যোগেশকে তিরস্কার করিল। সুধীরের ধারণা—যোগেশের তাচ্ছিল্যই রমার অসুখের কারণ।

যোগেশ লজ্জিত হইয়া বলিল—"তা' ব'লে ত আমি একটা ছেড়ে আর একটা বিয়ে ক'রতে যাচ্ছি না!"

সুধীর ঘা খাইয়া চেঁচাইয়া বলিল—"আমার অন্তর যদি তুমি দেখ্‌তে পেতে, তা' হ'লে ও কথাটা আর বল্‌তে না। আমি আজ পিতার কাছে সত্যবদ্ধ—না হ'লে———" সুধীরের কণ্ঠস্বর বাষ্পভরে জড়াইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

যোগেশ বিস্ময়-স্তব্ধ-চক্ষে সুধীরের দিকে একবার চাহিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে মনোরমার চক্ষেও জলধারা বহিতেছিল।

(৮)

স্বরূপার কাল বিবাহ হইবে। বিবাহের উৎসব আমোদের মধ্যে সে বেশ সহজ সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল বদনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মনের মধ্যে যে একটা প্রবল বিপ্লববহ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা তাহার

বাহ্যব্যবহারে কেহই বুঝিতেছিল না। সেদিন সে যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আমবাগানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মূর্ত্তি অনেকটা স্থির—তাহার চিত্তও যেন কোন একটা দৃঢ়ব্রতে আগুয়ান্।

রমা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—"রক্ষা কর, ভাই! ঠাকুরঝি বুঝি আর বাঁচে না।"

সুরূপা রুদ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া সোৎসুক চিত্তে বলিল—"কি হ'য়েছে তার বৌদি?"

রমা সাশ্রুকণ্ঠে বলিল—"কয় দিন তার জ্বর হ'য়েছিল, কাল হঠাৎ তাহার উপর বিকারের লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছে। ডাক্তাররা বলেন—তা'র মনে হঠাৎ একটা আঘাত লাগাতে এইরূপ অবস্থা হয়েছে। এই আঘাতটা দূর করলে সে বাঁচ্‌তেও পারে।"

সুরূপা তাড়াতাড়ি আসিয়া রমার হাত ধরিয়া বলিল—"আঘাত লেগেছে—কি আঘাত ভাই?"

রমা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে ঠাকুরজামাইয়ের বিয়ের কথা হওয়ার পর থেকেই সে কেমন যেন হ'য়েছিল। তার মনে যে গভীর আঘাত লেগেছিল, আমরা তা' বুঝ্‌তে পারি নি। এখন তুমি যদি ———"

"আমি যদি কি?

"তুমি যদি ঠাকুরজামাইয়ের আশা ত্যাগ কর, তবে———"

"এই সামান্য কথা——? আমি ত তাঁকে চাই না! তোমরা ত জোর ক'রে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছ!"

রমা বিস্ময়ের আতিশয্যে মুহ্যমান হইয়া তাহার সেই নিথর নিষ্কম্প

দেহলতিকার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। পরে বলিল—"তবে এ সব কি ভাই?"

"শুনিয়া কাজ নাই, আমাকে কি করতে হবে, তাই বল।"

রমা একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ক্ষমা কর ভাই! তুমি যখন এতটা পেরেছ, তখন এটাও পাব্‌বে—ঠাকুরঝির শ্বশুরের সেই কালো ভাগ্‌নেকে বিয়ে কব্‌তে হবে।"

"বিয়ে কর্‌তে হবে?" সুরূপা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। ক্ষণৈক পরে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"তাই হবে বৌদি! চল, মনোরমাকে দেখে আসি।"

এত বড় স্বার্থত্যাগ দেখিয়া রমাব বুকটা ফুলিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি ধরিয়া সাশ্রুকণ্ঠে বলিল—"স্বামী ছাড়া সংসারে আর কিছু জানি নি—স্বামীর রূপ গুণের দিকে ভাল ক'রে কোন দিন চাহি নি—স্বামীই যে ভাই আমাদের দেবতা! তোমার এই কালো স্বামীকে কি ভালবাসতে পার্‌বে না ভাই?"

এই আদরের আহ্বানে সুরূপার চক্ষে জল উথলিয়া উঠিল। এত দিন যে স্রোত রুদ্ধ হইয়া তাহার বুকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহা আজ রমার শিথিল আহ্বানে বাধা মানিল না। সুরূপা রমার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া যে সে কি সুখ পাইল, তাহা জানি না; কিন্তু রমা তাহাতে বাধা দিল না। দুই হাতে তাহার বুকখানাকে জড়াইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ দেখিল না—সুরূপার সেই কান্নারাশি আর কাহারও বুকে বাজিলও না।

(৯)

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। সুরূপার বিবাহের করুণ রসুনচৌকি তখনও থাকিয়া থাকিয়া যেন কাহার প্রাণের বিষাদ বেদনা গাহিয়া যাইতেছিল। চারিদিক্ সুষুপ্তিমগ্ন। মনোরমা বিকারের ঘোরে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। মাঝে মাঝে কি যেন কতগুলি বকিয়াও যাইতেছিল। সুধীব তাহার পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"কেমন আছ মনোরমা!"

মনোরমা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন কতগুলা অনির্দ্দেশ্য ছবি ফুটিয়া উঠিল। যেন কে তাহার কাণের কাছে আসিয়া তাহার নিঝুম প্রাণে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দিল। সে আপন মনে বলিল—"কে সুরূপা দিদি! বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছ? বেশ হ'য়েছে—মজা হ'য়েছে—আমার স্বামী কেড়ে নিতে এসেছিলে? —কেমন—এখন বিয়ে কর।"

সুধীরের চক্ষে জল আসিয়াছিল। সে মনোরমার হাতখানা তুলিয়া লইয়া তাহার চোখে চোখ স্থাপন করিয়া বলিল—"সুরূপা নয় মনোরমা! আমি, চিন্‌তে পাচ্ছ না?"

"কে তুমি? কই—চেলীর কাপড় কই? হাতে সুতা কই? বিয়ে ক'রতে যাও নি?"

"আমি ত মনোরমা, বিয়ে কর্‌তে চাই নি। তুমি থাক্‌তে আবার বিয়ে? তুমি যে আমার কত আদরের মনোরমা!"

মনোরমার কাণে সে কথাগুলি প্রবেশ করিয়াছিল কি না বুঝা গেল না। কিন্তু পরক্ষণেই সে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"কেমন—স্পর্দ্ধা কর

নয়! আমি কি তোমার দাসী? ইস্ ভারী যে আশা? সংসারে দাসীর ন্যায় থাক্‌তে হবে—সেবা কর্‌তে হবে! আমি এক্ষুণি চ'লে যাব।" অবসন্ন হইয়া মনোরমা শুইয়া পড়িল। সুধীর হতাশ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলমাত্র।

যোগেশ আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কি হবে ভাই—কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। সুরূপার কথাতেও ত কিছু নরম হ'ল না, বরং বেড়েই গেল। বোধ হয় সুরূপার আত্মত্যাগটা ওর হৃদয়ে আর একটা আঘাতের সৃষ্টি ক'রে দিলে।

সুধীর যোগেশের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণপরে যোগেশ বলিল—"তুমি বস, আমি একবার ডাক্তারকে দেখি।" যোগেশ চলিয়া গেল।

সুধীরের চিন্তার শেষ নাই। বিধাতার বিড়ম্বনায় সুখ বলিয়া একটা পদার্থের অস্তিত্বের কথাটা সে বড় বুঝে নাই। মনোরমার নবজীবনের সূচনার উদ্যোগে যখন সে উৎফুল্ল হইয়া আশাপথ চাহিয়া বসিয়াছিল, তখন কোথা হইতে একটা অকাল ঝঞ্ঝা আসিয়া তাহার নব আশা-তরুকে এমনভাবে যে উন্মূলিত করিবে, তাহা তাহার জানা ছিল না। যোগেশের কথার অবসানে তাহার চক্ষের সম্মুখে বিষাদের ঘন আঁধারের ছায়াগুলা যেন কোথা হইতে হু হু করিয়া আসিয়া জমাট বাঁধিয়া গেল। ধীরে ধীরে দূর—দূরান্তর হইতে যেন কালের কত পুঞ্জিত দুঃখদৈন্যের একটা হাহাকার ধ্বনি তাহার কর্ণে অন্তিম বিষাণ বাজাইয়া দিয়া গেল।

মনোরমা মৃদুস্বরে বলিল—"ভাব্‌ছ কি? এ যাত্রা আমি বাঁচ্‌ব না।" তাহার স্বরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা দেখা গেল।

সুধীর ভয়ানক চমকিত হইয়া বলিল—"ছি! ও কথা ব'লতে নেই। তুমি আবার বাঁচ্‌বে—আমায় সুখের সাগরে ভাসাবে।"

মনোরমা ক্ষীণহাস্যে বলিল—"জানি না কত পাপ ক'রেছিলাম। তুমি আমায় ক্ষমা কর, তোমায় অনেক দুঃখ দিয়েছি। আজ সুরূপার বিয়ে না হ'লে তাকে বিয়ে কর্‌তে তোমায় অনুরোধ কর্‌তুম।"

সুধীর মনোরমার সেই দেহযষ্টিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—"এ কি কথা—মনোরমা! আমি ত তার আশা করি নি। তুমি যেও না। আমাকে এমন ক'রে ফেলে পালিও না।" সুধীরের অশ্রুজলে মনোরমার মুখখানা প্লাবিত হইয়া গেল।

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল—"দুঃখ কি? মর্‌বার সময় তোমার মনেও যে আমার স্থান আছে, তাই জেনে গেলাম—এর বাড়া আর কি সুখ আছে? জন্মজন্মান্তরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। বৌদির মুখে শুনেচি—আমাদের এ সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন—তবে দুঃখ কি?"

'দুঃখ যে কি'—তাহা সুধীরই জানে। আজন্মকাল রূপের ধ্যান করিয়া—সোণার স্বপনে ভাসিয়া—যে নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়, তাহার নিকট বাস্তব জগৎটা বড় রহস্যময় বলিয়াই বোধ হয়। এই রহস্যের তালে তালে সুধীর চিরকাল ভাসিয়াছে। একটা নেশার মত প্রেমের মাদকতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া অবশতার ঢেউ তুলিয়াছে। আজ সেই সোণার স্বপন—আজ সেই নেশার ঘোর যখন সত্যসত্যই তাহার নিকট বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হইতে বসিয়াছিল, তখনই কে যেন তাহার নিকট হইতে—তাহা কাড়িয়া লইতে হাত বাড়াইয়াছে। যে এই অবস্থায় পড়িয়াছে, সেই জানে দুঃখ কত?

জগৎজোড়া মায়া মরীচিকার স্রোতে পড়িয়া মানুষ ত হাবুডুবু খায়।

তাহাতেও সুখ দুঃখ—তাহাতেও হাঁসিকান্না। কিন্তু তফাৎটা কি? সে না হয় মানুষের ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা বলিয়া সুধীরের এই বাস্তব স্বপনও কি মায়া হইবে—মতিভ্রম বলিয়া বোধ হইবে? মনোরমার হৃদয়ের ঐ অন্তিম ঐশ্বর্য্যও কি মায়া? তাহার এই সুখের ক্ষীণ স্মৃতিও, কি মায়া? তবে সত্য কোন্‌টা। সুখটা—না দুঃখটা? তোমরা বলিয়া দাও গো! সুধীর কোন্‌টা বিশ্বাস করিবে? এ জগতে তাহার ত স্মৃতিটুকু রহিল। এই মায়া স্মৃতিটুকু লইয়া কোন্ মরীচিকার অন্বেষণে সে কোন্ দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইবে? সে যে স্বর্গের দ্বারে উঠিতে গিয়া স্তূপাকার সুখের সন্ধান পাইয়া সেখান হইতে আজ আছাড় খাইয়া কোন্ পাপে ধরণীর শিলাতলে চূর্ণ হইতে বসিয়াছে? মনোরমার এই যে সাড়াহীন দেহলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনন্ত শূন্য জগৎটার ভিতর—ধরিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই——অবলম্বন নাই! তাহার অবশ ইন্দ্রিয়ের ভিতর আজ এ কিসের হাহাকার? আজ তাহার চারিদিকে রূপহীন—শব্দহীন—স্পর্শহীন অন্ধকারের এ কি আবির্ভাব? এ কিসের বিলোপের অশব্দময় নিমজ্জন।

(১০)

"সুধীর-দা! তোমার শরীর যে এখনও সারে নি ভাই! অমন ক'রে ভেব না।" জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীর স্নিগ্ধ আকাশ-তলে বসিয়া সুধীর ভাবিতেছিল—সুরূপা আসিয়া তাহাকে উক্ত কথাগুলি বলিল।

আকাশের গায়ে অনেকগুলা বড় বড় নক্ষত্র ঝলমল করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই একটার দিকে চাহিয়া সুধীর বলিল—"ভাব্‌চি নে রে বোন্! এই সময়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাক্‌তে বড় ভাল লাগে, তাই এখানে এসে ব'সেছি।"

সুরূপা আস্তে আস্তে বলিল—"আকাশের দিকে চাইতে তোমার এত ভাল লাগে কেন সুধীর-দা ?"

সুধীর হাঁসিয়া বলিল—"তোর বৌদি ব'লেছিল—জীবনে মরণে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকে। সেই জন্য আমি ভাবি—তাহার আত্মাটা নিশ্চয় আমার অপেক্ষা ক'রছে—আমার আশাপথ চেয়ে আছে। ঐ বড় নক্ষত্রটার দিকে চাইলে আমি যেন তার সেই ব্যগ্র-কাতর মুখখানা দেখ্‌তে পাই।"

সুরূপার চক্ষে হু হু করিয়া কতকগুলা অশ্রুরাশি কোথা হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। সে অঞ্চল দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাড়াতাড়ি কোথা হইতে যোগেশ আসিয়া সুধীরকে নাড়া দিয়া বলিল—"রমার কাণ্ডখানা দেখেছ, দু'দিনের জন্য তোমাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব, তা' মোটগুলা বেঁধেছে দেখেছ ? আমি যেন এখনও সেই খোকাটী আছি—আমি যেন একটুও কষ্ট কর্‌তে পার্‌ব না, তাই উনি আবার সঙ্গেও যাবেন।"

সুধীর হাঁসিয়া বলিল—"থাক্, আর কাহাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি এই তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও গিয়ে সুখ পাব না -তাই ভাবছিলুম।"

যোগেশ সুধীরের কম্পিত হাতখানা ধরিয়া সেইখানে বিমর্ষবদনে দাঁড়াইয়া রহিলমাত্র—কিছু উত্তর দিল না।

প্রতিশোধ

১

"দিদি! কি হবে?" মদালসা বিষাদম্লানমুখে পার্শ্বস্থা রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার স্তিমিত নিষ্প্রভনয়নের অস্ফুট জ্যোতি আসন্ন বিপদের ঘনঘটায় যে সমাচ্ছন্ন—তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল।

পার্শ্বস্থা রমণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"হবে আর কি? যেদিন হাতের শাখা দুটীকে জন্মের মত খুলে জীবনটাকে শূন্য করেছি—সে দিন থেকে ত মরণে আর ভয় রাখিনি, কিন্তু এই অন্ধকার জীবনে তুমিই একটু আলো জ্বেলে দিয়েছিলে—সেটা যদি নিভে যায়, আমারই বা আর থাকবার দরকার কি?" বিধবার দৃষ্টি যেন কোন সুদূর অতীতে যাইয়া সংলগ্ন হইল। সে যে সুখ-সৌন্দর্য্যের স্মৃতিকে পিষ্ট করিয়া—অফুরন্ত অনন্ত অতীতের কামনা-কলুষ-বিলাস-লালসার উপর সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া সাত্বিকের শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তার আর ভয় কি? বন্ধনই বা কি?

একটা আলোকিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া দুইটী রমণী কথা কহিতেছিল। সম্মুখে হোমকুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে মরণের লেলিহান শিখা যেন আগুবাড়িয়া আসিয়া উপস্থিত—"ওগো এসগো এস—তোমাদের জন্য আমার তৃষিত বক্ষ দাউ দাও করে জ্বলছে—এস এস আমার বক্ষ শীতল কর" সেই নীরব হোমাগ্নি যেন উভয়ের জীবনটাকে টানিতেছিল।

মদালসা সেই আগুনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—

"কই দিদি! আজও ত এলেন না? সুরভী দেবী যে বলেছিলেন, আজ আমাদের দুঃখের শেষ দিন—আজ আমাদের উদ্ধারের দিন—তিনি না এলে কি আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হবে না? আমাদের কি পুড়ে মরতে হবে?" মদালসা বিধবাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার অশ্রুজলে বিধবার স্কন্ধদেশ ভিজিয়া গেল।

"কি বল্‌ব বোন্? তোকে যে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে আমার জীবনটাকে অনন্তের কোলে ঠেলে নিয়ে যাব—তার ত কোন উপায় দেখ্‌ছি নি? আজ পাতালকেতু আস্‌বে—অত্যাচার কর্‌বে। তার হাত থেকে তোকে যে উদ্ধার করবে সে রাজপুত্র কই? সময় যে যায় বোন্?"

মদালসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—

"দিদি! দিদি!! আর বিলম্বে কাজ নাই। আমি আগে যাই। আকাশ থেকে ধর্ম্ম আমায় ডাক্‌ছেন—কে যেন আমায় এই পাপপুরীতে থাক্‌তে আর সময় দিতে চাচ্ছে না। আমি যাই—তুমি বিদায় দাও।" অশ্রুকণ্ঠে কুমারী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিধবার বলার কিছু ছিলনা। যে দিন দানব তাহাদিগকে হরণ করিয়া আনিয়াছে—যে দিন সে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে—সেইদিন থেকেইত তাহার জীবনের লীলা খেলা ফুরাইয়াছে। সংবৎসর-ব্যাপী ব্রতের ছলে এক বৎসর ত কাটিল। কিন্তু কেহ ত উদ্ধার করিল না। সুরভী দেবী আশ্বাস দিয়াছিলেন, শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে, কিন্তু কই! সময় ত যায়। বিধবা তাড়াতাড়ি

বলিয়া উঠিল—"না-না তুমি অপেক্ষা কর, আমি আগে যাই—তোমার মরা আমি দেখ্‌তে পারব না।"

কুমারী তখন অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিল—তাড়াতাড়ি বিধবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না না তুমি অপেক্ষা কর, সে যে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে চায়, তোমার বিলম্ব হ'লে ক্ষতি হবে না!"

তখন চারিদিক নিস্তব্ধ। ঘরে সূচীপতনের ও শব্দ নাই, কোথাও কোন আশা আশ্বাসের চিহ্ন নাই। আসন্ন দুর্দ্দিনের মত, মস্তকে আসন্ন বজ্রপাতের পূর্ব্বক্ষণের মত—উভয়ে স্থির ধীর! কেবল অগ্নির লেলিহান জিহ্বা লক্‌ লক্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

সেই গৃহে তখন একটা মায়ার খেলা খেলিয়া গেল। তখন একটা যেন পিণ্ডিত তড়িত্‌ মূর্ত্তির মত সুন্দর পুরুষ হঠাৎ সেই গৃহ কুট্টিন ভেদ করিয়া সেই অগ্নিপ্রবেশোদ্যত সুবর্ণ অঙ্গলতাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—"ছিঃ সুন্দরি! আমাকে ফেলে পালিও না।"

মদালসা দারুণ ভয়ে সেই যুবকের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

বিধবারও মাথা ঘুরিতেছিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদশ্রুতি হইতেছিল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়াছিল, ক্রমে সেই জগৎটা তাহার সম্মুখ হইতে বিলুপ্ত হইতেছিল।

সেই পুরুষ তখন কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"ছি দিদি! ভয় পেও না। আমিত দানব নই। সে অনেকক্ষণ যমের বাড়ী গেছে। আমি যে সেই রাজপুত্র।"

বিধবা আনন্দে অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল।

(২)

"ভাবছ কেন ভাই?" একটী সুন্দর ঋষিকুমারের মুখ দিয়া এই কয়টী কথা বাহির হইল। তখন সন্ধ্যাকাল। যমুনাতীরের নিকটবর্ত্তী তপোবনের মধ্য দিয়া সান্ধ্যমধুর আহুতির গন্ধ চারিদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ক্বচিৎ যমুনাবারির আলোড়নের শব্দ কর্ণগোচর হইতেছিল!

ঋতধ্বজ যমুনাবারির সম্মুখে একখানা ক্ষুদ্র শিলার উপরে বসিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল।

"ভাব্‌ব না ভাই! আজ সাত দিন বাড়ী ছেড়ে এসেছি। তার সেই অশ্রুভরা মুখখানা যে ভাই! সকল কাজের মধ্যেই দেখ্‌তে পাই?"

ঋতধ্বজের চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। তার যে প্রাণমন পত্নীময়। মদালসার গুণ, মদালসার ভালবাসা, মদালসার অপূর্ব্ব রূপমাধুরীই যে তাহার জীবন-গ্রন্থি। ক্ষণেকের তরে তার অদর্শন যে কখন সহিতে পারে না, আজ তাহাকে ছাড়িয়া ঋষির কাজে,—ঋষির যজ্ঞ রক্ষার্থে আসিতে হইয়াছে! হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু মনটা এমন করে কেন? ঋতধ্বজ যমুনার কালো জলে সূর্য্যের সেই রাঙা মুখে নামা দেখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"তুমি কি বুঝ্‌বে ভাই,—আমাকে দিয়া তাহার সেই কুসুমকোমল দেহখানিকে সাজাতে কত সাধ ছিল। কত ছন্দে—কত কৌশলে—সেই কথা সে আমাকে বলেছিল—কিন্তু তখনও সেই অলঙ্কার সাজান হয় নাই, তখনও সেই ফুলের মালা তাহার গলায় পরান হয় নাই, তখনও সেই রত্নহার তাহার বক্ষে ঝুলান হয় নাই, কুঙ্কুম চন্দন যে ভাই তখনও

তাহার সেই কুন্দকোমল শুভ্র গণ্ডে চিত্রিত করা হয় নাই। ছি! ছি!! এমন সময়ে তুমি ডাকিলে!" টপ্ টপ্ করিয়া ঋতধ্বজের চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দুগুলি শিলার উপর পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

নিকুম্ভ ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে আসিয়া হাতখানি ধরিয়া বলিল —"কি করব ভাই? আমি কি তখন বুঝতে পেরেছিলাম! ঋষির সর্ব্বনাশের কথা যে ভাই, তখন আমার মনটা চঞ্চল করে তুলেছিল। তুমি এলে—আশ্রম আবার সজীব হ'ল! ছি! ছি! এ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিও না।"

"দুর্ব্বলতা? দুর্ব্বলতা কোথায়? তার যখন সাধ আহ্লাদকে দূরে ফেলে, প্রেম পিপাসা, হৃদয়ের সমস্ত বন্ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আসতে পেরেছি, তখন দুর্ব্বলতা কোথায়? কিন্তু তুমি ত জান না ঋষি! সে যে আমার কি?" ঋতধ্বজ নিকুম্ভের মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

"জানব কেমন করে ভাই? তুমি ত আমাকে বলনি!"

"দৈত্যের উৎপীড়নে আগুনে পুড়ে মরতে গিয়েছিল, ঝাঁপ দিয়েছিল— আমিই ত তাড়াতাড়ি তা'কে সেই নরককুণ্ড হ'তে রক্ষা করেছিলাম। সে যে আমার যমের বাড়ী হতে ফিরে পাওয়া ভাই?" ঋতধ্বজ কাঁপিতেছিল। এমন সময়ে চারিদিকে একটা কোলাহলের তরঙ্গ দিক্ মথিত করিয়া নিনাদিত হইয়া উঠিল।

নিকুম্ভ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"ঐ ঐ আবার এসেছে উঠ—উঠ—"

"অশ্ব, অশ্ব"। ঋতধ্বজ লম্ফ দিয়া নিকটস্থ অশ্বে আরোহণ করিল। ক্ষণপরেই তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

(৩)

প্রভাত হইয়াছে। যমুনাতীরের তপোবনের উপর দিয়া অন্ধকারের যে আচ্ছাদনটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—তাহা কোন্ মায়াজালে ধীরে ধীরে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। চারিদিক্ আনন্দের উল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল। ঋষিগণের বেদধ্বনিমুখর সেই তপোবন তখন শান্ত—মধুর—উজ্জ্বল।

মহর্ষি হারিত প্রণত ঋতধ্বজকে উঠাইয়া বলিলেন,—"ধন্ত বীরত্ব! আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হও।"

ঋতধ্বজ নতমুখে বলিল—"আপনাদের তপঃপ্রভাবেই আজ আমি বীর। আমার সমস্তই আপনাদের আশীষের ফল। আমি সামান্য;—সামান্য মানবের সাধ্য কতটুকু?"

হারিত প্রীত হইয়া বলিলেন—"তপস্যার প্রভাবে সমস্ত সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সামান্য কর্ম্মে তপঃক্ষয় করা উচিৎ নহে বিবেচনা করিয়াই তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। আজি হইতে পঞ্চদশ দিবস আমি এই গৃহে সমাধিতে উপবিষ্ট হইব। তুমি প্রহরা দিবে, কদাচ দ্বার উদ্ঘাটন করিও না—করিলে সমূহ বিপদ্। পঞ্চদশ দিবসের পর আমার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে—তুমিও মুক্তি পাইবে।"

ঋতধ্বজ নতমুখে বলিল—"যে আজ্ঞা!"

মহর্ষি হারিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তোমার কাছে কিছু অর্থ আছে কি? যজ্ঞের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে।"

ঋতধ্বজ হাস্যমুখে বলিল—"অন্য অর্থ ত সঙ্গে নাই, তবে আমার এই

কণ্ঠভূষণ উজ্জ্বলরত্ন আছে, ইহাই গ্রহণ করুন।” কণ্ঠ হইতে সেই হারছড়াটা খুলিয়া ঋতধ্বজ মহর্ষির পাদমূলে স্থাপিত করিল।

ঋষি তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিলেন। ঋতধ্বজ খুন্নচিত্তে যেন কি হারাইয়া বড় ব্যথিত হইয়া আশ্রমের প্রান্তে আসিয়া একটী আম্রকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিল। বসন্তের প্রথম সমাগমে বৃক্ষগুলি মুকুলিত হইয়া বড় মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে মুকুলের মধুর গন্ধ প্রাণে যেন কিসের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছিল। দুই চারিটা বসন্তের পাখী কলগুঞ্জনে ঋতধ্বজের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

নিকুম্ভ আসিয়া বলিল—“কি হে! সহকার-কুঞ্জে কি মনে করে?”

ঋতধ্বজ পরিষ্কৃত বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল—“কি করব বল? দিনটা ত কাটান চাই?”

নিকুম্ভ হাঁসিয়া বলিল—“বটেই ত! কিন্তু এখানে কি থাক্‌তে পারবে? পাখীর পঞ্চমস্বরে কাহারও কি সেই কলধ্বনি মনে পড়্‌বে না?”

ঋতধ্বজ গাত্র হইতে কতকগুলা পোষাক নামাইয়া ধীরস্বরে বলিল—“পড়্‌বে বলেইত এখানে এসেছি?”

নিকুম্ভ তাহার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল—“তোমার সেই আদরের কণ্ঠহারটা গেল কোথায়?”

“ঋষির যজ্ঞকার্য্যে সমর্পণ করেছি। এ ত সামান্য ভাই?”

নিকুম্ভ বিস্মিত হইয়া বলিল—“সামান্য! আস্‌বার সময় তোমার সোহাগের পত্নী আদর করে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তুমি বলছ সামান্য?”

ঋতধ্বজ উত্তেজিত হইয়া বলিল—“হাঁ হাঁ সামান্য! জান না তোমাদের

জন্য ঋতধ্বজ প্রাণটা পর্য্যন্ত হাতে করে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে।" তাহার চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল।

নিকুম্ভ তাহার সেই উজ্জ্বল দীপ্ত দেহখানার দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তুমি এমনিই বটে! সে যাহা হউক, আমি ত ভাই আজ যজ্ঞের প্রয়োজনে নগরে যাব। তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি।"

ঋতধ্বজ উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"শীঘ্র এস ভাই! জান ত, প্রবাসের এই বিরহের মধ্যে তুমিই আমার অবলম্বন।"

(৪)

মহর্ষি হারিতের নয়ন দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। রাজা শত্রুজিৎ সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"সহ্য হয় না মহর্ষি! আপনার কথা শেষ করুন।"

ঋষি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"কি বলিব, মহারাজ! আমি যে জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা নাইলে আমার মুখ দিয়া আপনাকে আজ এই বজ্রপাতের সংবাদ দিতে হইবে কেন? মহারাজ! আমাদের রক্ষার জন্য—আমাদের কল্যাণের জন্য দৈত্য-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুত্র ঋতধ্বজ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তপস্বিগণ তাঁহার সৎকার করিয়াছেন। তিনি মৃত্যু সময়ে এই হারছড়াটা আমার হস্তে দিয়া শেষ সংবাদ দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহারাজ! এই সেই—হার!" যজ্ঞের প্রয়োজনে যে হারটা মহর্ষি ঋতধ্বজের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই হারটাই আজ

তাহারই মৃত্যু সংবাদের সাক্ষী-রূপে ভূমিতে রক্ষিত হইল। অন্তরের পৈশাচিক প্রবৃত্তি দমন করিয়া—ঋষি আজ শোকাকুল! অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

একটা বিকট হাহাকারধ্বনি চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া রাজপুরীকে কম্পিত করিয়া তুলিল। বিষাদের ঘন ছায়া চারিদিকে যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজা, রাণী, পৌরজন শোকাবেগে একেবারে মুহ্যমান। আর মদালসা! তাহার চক্ষুতে অশ্রু নাই—মুখে কথা নাই। সে সেই তাহারই শেষ স্মৃতিচিহ্নের জন্য আদর-করে-দেওয়া রত্নহারটা কুড়াইয়া লইয়া—গৃহে প্রবেশ করিল। চারিদিকেই তাহার স্বামীর চিহ্ন! স্বামী যে তাহার প্রসাধন শেষ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দনপাত্র যে শুষ্ক হইয়া এখনও রহিয়াছে, ফুলের মালাটীর ফুল শুখাইয়াছে কিন্তু তাহার কঙ্কালটা যে এখনও অফুরন্ত পিপাসা লইয়া কাহার কোমল করস্পর্শে উজ্জীবিত হইবার জন্য যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। সেই অলঙ্কার, সেই পরিচ্ছদ যে এখনও তেমনি ভাবেই সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু একটী নাই! এই জড় পদার্থগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবে যে, সে কোথায়? সেই যে সেদিন তাহার জীবনের প্রভাতকৃত্যকে অসমাপ্ত রাখিয়া সরিয়া পড়িল—আজ সে কত দূরে? সৌদামিনী-দীপ্তির ন্যায় সে ক্ষণকাল প্রভা বিস্তার করিয়া তাহার অন্তর চিরিয়া একটী গাঢ়রেখা অঙ্কিত করিয়া কোন্ অনন্তের ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছে?

মদালসা সেই প্রসাধন সামগ্রীগুলি একে একে গুছাইয়া লইল। বিশুষ্ক মাল্য, বিশুষ্ক চন্দন, কুঙ্কুম, আশ্যান, অলক্তক, সিন্দূর, বস্ত্র, অলঙ্কার যাহা ছিল সমস্তই গুছাইয়া লইল। স্বামীর পরিত্যক্ত পাদুকাযোড়াটা লইয়া স্বামীর পরিধেয় বস্ত্র লইয়া সাধ্বী শেষে তাহার প্রিয় শুক সারিকাকে

পিঞ্জর-মুক্ত করিয়া দাসদাসীকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া তারপর স্বামীর বৈতান-বহ্নিতে কলেবর আহুতি দিয়া অন্তরের দারুণ দাহ নির্ব্বাণ করিল —সব শেষ হইল।

রাজা রাণী সমস্তই দেখিলেন। দ্বিগুণতর শোকাচ্ছ্বাস বহন করিয়া সমস্তই দেখিলেন। তারপর পুত্রের কীর্ত্তিগাথা স্মরণ করিয়া আপনিই শান্ত হইলেন। পুত্র যে আশ্রম রক্ষা করিতে গিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পুত্র যে ব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়া অমরধামে গিয়াছে। এর বাড়া ক্ষত্রিয়ের আর সৌভাগ্য কি? এর বাড়া বীরের আর বাঞ্ছিতই বা কি?

আর পুত্র-বধূ! স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কি গতি আছে? স্বামীর মরণে স্ত্রীর আর নশ্বর দেহ লইয়া প্রয়োজন? বিবাহের সময় আত্মায় আত্মায় মিলিয়া সে যে এক হইয়াছে। এখন স্বামীর অভাবে সে কি আর সংসারে থাকিতে পারে? তাহার যে ডাক্ পড়িয়াছে! স্বর্গে থাকিয়া স্বামীর ক্ষুধিত আত্মা যে তাহার পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। মদালসা কি আর থাকিতে পারে?

রাজা রাণী শান্ত হইলেন।

(৫)

'মনটা খারাপ হয় কেন? হৃদয়ের অন্তস্তলে হঠাৎ তুষানল জ্বলিয়া উঠে কেন?' সেদিন সন্ধ্যামধুর প্রকৃতি বুকে কালো অবগুণ্ঠনের পরদাটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্র ঋতধ্বজ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। আজ পঞ্চদশ দিবস তিনি বিনিদ্রনয়নে শান্তমনে আশ্রম রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আজ এমন্ হ'ল কেন? একি! বাহুতে জোর নাই! হৃদয়ে সাহস

নাই! চরণ আর চলে না কেন? একি! গুরু গুরু মনটা কাঁপে কেন? আজ শেষ দিন! ঋষি বলিয়াছেন—কাল মুক্তি পাইব। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী যাইয়া পৌঁছিব! পিতামাতার সেই হাসিমুখের অভিনন্দন, প্রিয়তমা পত্নী মদালসার সেই অশ্রুভরা মিলন-সম্ভাষণ রাজপুত্রের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল! থাক মদালসে! একরাত্রি অপেক্ষা কর, তোমার সেই ক্ষীণ তপ্ত দেহযষ্টিকে বক্ষের মধ্যে লইয়া দারুণ বিরহ-জ্বালা নিভাইব। কিন্তু—রাজপুত্র বিষণ্ণ চিত্তে ঘুরিতে লাগিলেন।

আশ্রমের চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কোথায় কোন জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। আকাশের গায়ে পূর্ণিমার চাঁদ রজত ধারায় চারিদিক শুভ্র চূর্ণ ছড়াইতে ছিলেন। বড় বড় নক্ষত্রগুলা জ্বল জ্বল করিয়া চাহিয়া পৃথিবীর বুকে কি যেন সোহাগভরা প্রীতির প্রতিমা খুঁজিতেছিল। দূরে গাছের কোটরে লুক্কায়িত একটী পেচক কর্কশ স্বরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

ঋতধ্বজ কোনদিন আশ্রমের এইরূপ নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করে নাই। তাহার মনে যেন কেমন একটী বিপদের ভাব জাগিয়া উঠিল। এই অরণ্য-মধ্যে আকুল অতন্দ্র একটী বিষাদের নিবিড় প্রেতাত্মা যেন হা হা করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। আশ্রমের যে কুটীরে মহর্ষি হারিত সমাধিমগ্ন ছিলেন, ঋতধ্বজ ঘুরিতে ঘুরিতে সেই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। একি! কোথাও কোন প্রাণীর চিহ্ন নাই কেন? এখানে কি কোন লোক ছিল না? এখানে কি মানুষ বাস করিত না? সব কি ছায়া? আমার মাথা কি খারাপ হইল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমি কি পথ ভুলিয়া এ পরিত্যক্ত শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছি? না না! এই ত সেই আশ্রম! এই সেই মহর্ষি হারিতের কুটীর! একি!

গৃহ শূন্য! মহর্ষি! মহর্ষি! কেহ ত কোথাও নাই! রাজপুত্র কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। একটা ভোজবাজীর মত একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার সজীব সৃষ্টির মত জগৎটা যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এমন সময় সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া, কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"রে পাপিষ্ঠ! আমার ভ্রাতা পাতালকেতুর নিকট হইতে তুই মদালসাকে কাড়িয়া লইয়া আমাদের বুকে যে শেল হানিয়াছিলি—আজ তার প্রতিফল পাইবি! আমিই হারিত ঋষির ছলে তোকে ভুলাইয়া আশ্রমে আনিয়াছি। আমার নাম তালকেতু।"

রাজপুত্র চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বীর বাহু কম্পিত হইতে লাগিল। রোষে ক্ষোভে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতে লাগিল। দৃঢ়হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া রাজপুত্র বলিয়া উঠিলেন—"তিষ্ঠ দুরাত্মন্! এই মায়া আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে তোরও ভব লীলা সাঙ্গ হইবে।" তখন ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

(৬)

পিতার বক্ষের মধ্যে অশ্রুসিক্ত মুখখানা রাখিয়া ঋতধ্বজ ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"বাবা!'

টপ্ টপ্ করিয়া শত্রুজিতের চক্ষের জল ঋতধ্বজের মস্তকের উপর পড়িতেছিল,—তিনি একহস্তে তাহা মুছিয়া বলিলেন—

"ফিরে এসেছ ত বাবা!" তখনও রাজার বিশ্বাস হইতেছিল না পুত্র আসিয়াছে কি না! তিনি নিবিড়ভাবে পুত্রকে চাপিয়া ধরিয়া ছিলেন, পাছে ছাড়া পাইলে বুঝি কোন্ মায়াজালে এখনি কোন্ শূন্যে মিশিয়া যাইবে।

"আর কোন ভয় নেই বাবা! তালকেতুকে সবংশে মেরে ফেলেছি। সব ভাল আছে ত বাবা?" ঋতধ্বজ হাঁফাইতে হাঁফাইতে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

কিন্তু চারিদিকে কান্নারাশি উথলিয়া উঠিল। নূতন করিয়া যেন সেই রাজবাড়ীতে একটী অশ্রুস্রোত আবার বহিতে লাগিল। পিতা পুত্রের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া তিনি পুত্রকে বধূমাতার মৃত্যু সংবাদ দিবেন। আর্জ আনন্দাশ্রু শোকাশ্রুতে পরিণত হইল।

ক্রমে রাজপুত্র সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, ক্রমে সমস্ত ভাবিতে পারিলেন। যে আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়াছিল আজ সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইবার সময় কুমার শোকে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। কত অতীত ঘটনা—কত অতীত স্মৃতিলিপি শেলের মত তাঁহার কান্ত হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। মনে পড়িয়া গেল—গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু কন্যা হারাইয়া উন্মত্তবৎ ঘুরিতেছিলেন। মনে পড়িয়া গেল—তিনি দৈবযোগে এক অশ্ব লইয়া ঋষির যজ্ঞ রক্ষার্থে এক তপোবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনে পড়িয়া গেল সেখানে এক দানবকে বানবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে করিতে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি দেখিলেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী দানবভয়ে বহ্নিপ্রবেশোদ্যতা। তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার বংশের পরিচয় পাইয়া বিবাহ করিলেন। সে কি আনন্দের দিন! বিবাহ-মন্ত্রের সঙ্গে তাহার হস্তে রক্ষিত সেই শিরীষকোমল করকিশলয়ের কি অভূতপূর্ব্ব কম্পন তাহাকে অবশ করিতেছিল। তার পর সুখে দুঃখে সেই মনোহর মূর্ত্তিখানাকে 'হৃদয়ের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়া অতীতের দিনগুলি কি মাদকতার ভিতর দিয়াই

বহিয়া গিয়াছিল। আজ কোথায় তুমি মদালসে! আমার উপর রাগ করিয়া কি আমায় পরিত্যাগ করিলে! তোমার প্রসাধন শেষ না করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই কি অভিমান-ভরে চিরজীবনের মত লুকাইয়াছ? আমি যে ঋষির রক্ষার্থে গিয়াছিলাম। তুমি ত এরূপ কার্য্যে আমাকে কখন বাধা দাও নাই! তোমার সুখকর হউক বা দুঃখময় হউক, ভালকাজে কখন ত তুমি দৃক্‌পাত কর নাই! তবে আবার হাঁসিমুখে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছ না কেন?

এস এস শীঘ্র এস! তোমার পদতল যে এখনও অলক্তক রাগে রঞ্জিত করা হয় নাই। এখনও তোমার কমনীয় মনোহর বক্ষঃস্থলে মালতীমালা পরান হয় নাই, তোমার সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ লইয়া এখনও যে ক্রীড়াচ্ছলে বেণী বাঁধা হয় নাই। একবার এস! সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত লজ্জানম্র শিরীষসুকুমার মুখে মৃদু হাঁসি লইয়া! একবার এস, লীলা বিস্ফারিত পদ্মচক্ষের শুভ্র চাহনির সঙ্গে বক্রকটাক্ষ লইয়া! একবার এস হৃদয়গগনের পূর্ণচন্দ্ররূপে সমস্ত অন্ধকার নাশ করিয়া। এস এস! একটীবার এস! তোমার লীলাচঞ্চল গতিভঙ্গী যে এখনও আমি দেখিতে পাইতেছি!!

(৭)

আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিয়াছে। সে দিন পূর্ণিমার চন্দ্রদেব আকাশপটে প্রীতির ফোয়ারা ছড়াইতে ছিলেন। নক্ষত্রগুলা মিটি মিটি তাহাই দেখিতেছিল।

ঋতধ্বজ বলিল—"তবে চল ভাই! দেখ্‌তে চেয়েছ, চল, কিন্তু—" কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। রাজ-

পুত্র আর—বলিতে পারিলেন না। পার্শ্বে একটী সুন্দর যুবক নত নেত্রে দাঁড়াইয়া ছিল—সে বলিল—"থাক্, আজ কাজ নাই। আর একদিন দেখ্‌ব।"

সম্মুখে প্রমোদোদ্যানের বড় বড় হর্ম্ম্যগুলি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। উদ্যানের বড় বড় ঝাউবৃক্ষগুলি শোঁ শোঁ করিয়া কাহার ব্যথা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিতেছিল। রাজপুত্র সেদিকে চাহিয়া বলিলেন—"থাক্‌বে কেন? আমার পক্ষে সব দিনই সমান! আজ এক বৎসর এদিকে আসিনি, আজ আমাকে যেন কে আকর্ষণ কচ্ছে। কে যেন আমার আত্মাকে ধরে টান্‌ছে। চল, আজই মদালসার প্রিয় গৃহ দেখ্‌ব।"

পার্শ্বস্থ যুবক আর কিছু বলিল না, সঙ্গে চলিল। এই যুবকের সঙ্গে রাজপুত্রের বড় বন্ধুত্ব হইয়াছে। কোমলস্বভাব,—প্রীতিপূর্ণ হৃদয়,—আর সরল ব্যবহারে রাজপুত্র মুগ্ধ হইয়া জীবনের সমস্ত ঘটনা—বন্ধুকে বলিয়া ফেলিয়াছেন।

যুবকের নাম সুশর্ম্মা। সুশর্ম্মা একদিন মদালসার—বিহারবাটিকা দেখিতে চাহিয়াছিল। রাজপুত্র তাই তাহাকে সেখানে লইয়া চলিয়াছেন।

সেই প্রমোদোদ্যানের মধ্যে আনন্দ-নিকেতন। পার্শ্বে আনন্দ উদ্যান—আর পশ্চাতে কলনাদিনী গোমতীনদীর পুন্যপ্রবাহ। দৌবারিক আসিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

কোথা হইতে দুইটা শুক সারিকা উড়িয়া আসিয়া রাজপুত্রের হস্তে বসিল। তাহারা বড় কৃশ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সে লাবণ্য নাই, সে কান্তি নাই, সে ক্রীড়াচপল ভাব-ভঙ্গীও নাই। এই শুকসারিকাকেই মদালসা কত শিখাইয়াছে—কত পড়াইয়াছে,—কত আদর যত্নে খাওয়াইয়াছে,

বড় করিয়াছে। মরিবার সময় ছাড়িয়া দিয়াছিল বটে ; কিন্তু সেই তির্য্যক্ জাতিরাও কি যে একটা স্মৃতি পাইয়াছিল তাহা ভুলিতে পারে নাই, তাই সেখানে এখনও আছে। সারিকা মৃদুস্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—

"আর্য্য-পুত্র' কেমন আছ ? এতক্ষণে কি দাসীকে মনে পড়িল ?" এযে মদালসার শেখান কথা। এরা এখনও ভুলে নাই। কত ভঙ্গীতে মদালসা ইহাদিগকে এই প্রিয় কথাকয়টা শিখাইয়াছে। রাজপুত্র মদালসার কাছে এলে সারিকাই যে আগে হইতেই তাহার প্রাণের কথা কয়টা এমন করিয়াই বলিয়া দিত। সমস্ত মনে পড়িল। স্মৃতি! হায় প্রিয়তমে! তুমি এমনিই ছিলে? একটু দেরী সহ্য হইত না। ক্ষণেকে অন্ধকার দেখিতে! কিন্তু কোথায় তুমি? রাজপুত্রের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সুশর্ম্মা তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"তোমাকে কি ভাই, এই জন্যই আনিয়া ছিলাম? আমার জন্য কত কষ্ট পেলে!"

"কষ্ট! কষ্ট কি? যে আমার অভাবে সংসার অন্ধকার দেখে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে পেরেছে! তার স্মৃতিটুকুকে শুধু বুকে করে বহা কি এতই কষ্টকর? এস এদিকে এস! এই দেখ সেই প্রসাধন গৃহ! ঐ দেখ সেই অলক্তক! ঐ দেখ সেই কুঙ্কুম চন্দন রেখা! ঐ দেখ সেই সুগন্ধি জলপূর্ণ ভৃঙ্গার! ঐ দেখ সেই দর্পণ! ঝর ঝর করিয়া মুক্তাস্থূল অশ্রুবিন্দুগুলি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

সুশর্ম্মা অধীর হইয়া বলিল—"সখে আর দেখা যায় না!"

"দেখা যায় না কি? এইখানে সে বসিয়া আমার দিকে মৃদু-হাস্তে চাহিয়াছিল, এইখানে চন্দনকুঙ্কুম রাখিয়া ফুল্ল-গণ্ড-স্থলে আমার কঠিন করের স্পর্শ অপেক্ষা করিয়াছিল। এইখানে আমাদের শেষ বিদায়

সম্ভাষণ! এইখানেই আমার জীবনের আনন্দ উৎসবের শেষ অভিনয়! এইখানেই তাহার মরণের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল!" রাজপুত্রের চক্ষুতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সুশর্ম্মা ব্যথিত হইয়া বলিল—"চল আর এক ঘরে যাই।"

"না না সখে! ঐ দেখ মদালসার আল্‌তা-পরা পায়ের অস্ফুট চিহ্ন! এখনও মুছে যায় নি! দেখ দেখ আমি যে তাহার কোমল-কান্তি চরণ দুটী দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই যে মদালসা আমার দিকে কোপ-কটাক্ষে চেয়ে রয়েছে। প্রিয়তমে! রাগ কর্‌লে কি? বড় বিলম্ব হয়েছে আস্‌তে! না? এই আমি তোমাকে শান্ত কর্‌ছি—কি কর্‌ব বল? যজ্ঞ সমাপন না হ'লে ত আর আস্‌তে পারি না! ছি! ছি!! অভিমান কর্‌তে নেই! আচ্ছা আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি।" রাজপুত্র বসিবার উপক্রম করিল। সুশর্ম্মা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"সখে! উন্মত্ত হ'লে? কোথায় মদালসা?"

রাজপুত্র উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

(৮)

"সখে! এই আমার শয়নগৃহ! এই পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া কত রাত্রি ভাবহীন ভাষাহীন কাহিনীগুলিতে বিচিত্র-ভাবে অতিবাহিত করেছি। কপোলে কপোল স্পর্শ করে, বুকে বুক রেখে কতদিন যে শুধু আলিঙ্গনের মধ্যে রাত্রিটী কখন শেষ হয়েছিল—জান্‌তে পারি নি। ঐ দেখ সখে! প্রিয়তমার পরিধেয় বসনস্খলিত পুষ্পপরাগ! ঐ দেখ সখে! এখনও তাহার ওড়নাখানা আলুথালুভাবে পড়ে রয়েছে!" রাজপুত্র উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেখিতে লাগিলেন।

সুশর্ম্মা বলিল—"ভাই! এখানা কার ছবি?" ভিত্তি-গাত্রে একখানা প্রকাণ্ড স্ত্রীমূর্ত্তি চিত্রিত ছিল। সুশর্ম্মা তাহারই দিকে অঙ্গুলি নিঃক্ষেপ করিয়া কথা কয়টী বলিল।

"ছবি! ছবি কই? এই যে প্রিয়তমে! রাগ করেছ বুঝি? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস এস, লজ্জা কেন? রাজপুত্র বাহু বিস্তার করিয়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন।

সুশর্ম্মা ধরিয়া বলিল—"এখানে আর নয় ভাই! দেখতে যে পারি না, চল নদীতীরে যাই।"

রাজপুত্র উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ছি! ছি! ছেড়ে দাও—দেখ্ছ না রাগ করেছে যে, আগে ঠাণ্ডা করে আসি—তার পরে যাব।"

সুশর্ম্মা পৈশাচিক হাঁসি হাঁসিয়া বলিল—"ও যে ছবি! চল নদীতটে যাই।"

"ছবি? হায় সখে! একটুখানি কাল প্রিয়তমাকে সজীব দেখতে-ছিলাম—তাও তুমি দেখ্তে দিলে না! নিষ্ঠুর! চল যেখানে তোমার অভিপ্রেত!"

উভয়ে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

চন্দ্রদেব আকাশে হাঁসিতেছিলেন। নীচে ফুল্লফুলগুলি পাংশুমুখে ইতস্ততঃ চাহিয়াছিল। মৃদুমন্দ স্নিগ্ধসমীরণে তাহাদের শাখাগুলিও দুলিতেছিল। রাজপুত্র পরিচিত কুঞ্জের তলা দিয়া, স্নিগ্ধ ক্রীড়া-প্রস্রবনের পার্শ্ব দিয়া, কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বতের উপর দিয়া উদ্যানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন—সম্মুখে প্রাচীর। প্রাচীর-গাত্রে দ্বার। দ্বারের অপর পার্শ্বে নদীর তরঙ্গ-হিল্লোল।

সুশর্ম্মা তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার যেন বহুদিন পরে কাহার সাড়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—"সে "এ-খা-নে-এ——।" নদীর অনাবৃত বক্ষে প্রতিধ্বনি উঠিল—"এ-খা-নে-এ!"

রাজনন্দন উন্মাদ হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—গোমতী-নদীব সলিলোপরি তাঁহার কতকালের আরাধনার ধন—মদালসা কুঞ্চিত অঞ্চল দুলাইয়া অৰ্দ্ধমগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মানা হাঁসিতেছে।

শ্বতধ্বজ দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া বলিল—"দাড়াও দাড়াও প্রিয়তমে! এই আমি আস্‌ছি!" বলিয়াই সে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

তখন বাদামি-রঙের অঞ্চল খানা ডুবিতেছিল, মদালসার সেই মৃণাল মৃদুল হস্ত দুইখানা ভাসিতেছিল, ক্রমে সেই কৃষ্ণকেশ গুচ্ছ, ক্রমে ডবিল।

ক্ষণেকপরে রাজপুত্রকেও আর দেখা গেল না। কেবল একটা নদীর আলোড়নের শব্দ।

কিন্তু একি! সুশর্ম্মা হাঁসে কেন? একি! একে সেই রাজপুত্রের বন্ধু নিকুম্ভ! নিকুম্ভ ঋষি ত? কিন্তু ঋষিও ত নয়? এ যে ভীষণ দানব! এর কপালে যে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—প্রতিশোধ।

বিদায়।

(১)

বিজয় আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—"পণ্ডিত মহাশয়! কবিতাটা শুনুন ত,—

"অন্ধমানস অক্ষম প্রভু,
তোমার স্বরূপ চিনিতে;
দেখে নি কখন, জানে নি কখন,—
পারে নি কখন বুঝিতে॥"

"হাঁ হাঁ মাটি হ'য়ে গেল।" শঙ্কর বিরক্তি-পূর্ণ-স্বরে কথাগুলি বলিয়া পাশ ফিরিয়া বসিল। বিজয়ের আর পড়া হইল না। কোথা হইতে কতগুলা বিষাদ-বেদনা তাহার সুন্দর কিশোর মুখখানাকে ম্লান করিয়া দিল। সে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে বলিল,——

"কোন্ খানটা খারাপ হয়েছে?"

শঙ্কর হাঁসিয়া বলিল—"মুখ খানা যে কালী করে ফেল্‌লে! আমি বাপু! তোমাদের ও সব কবিতা বুঝ্‌তে পারি নে। মনটা অন্ধ হলে না হয় মানলুম যে দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু সে যে কেন জান্‌তেও পারে না, তা' বুঝ্‌তে পারি নে।" শঙ্কর আগ্রহপূর্ণনেত্রে বিজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিজয় স্কুলে পড়ে, শঙ্কর সেই স্কুলের পণ্ডিত। কিন্তু তাদের পরিচয়টা ঠিক এভাবে হয় নি। বিজয়ের যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন একদিন

হঠাৎ অজানাভাবে উভয়ের মিল হয়ে গেল। সে আজ সাত বৎসরের কথা, যে দিন কিশোর বয়সের অভিনব সৌন্দর্য্য নিয়ে কোমল হৃদয়ের কবিত্ব-মাখা স্বপ্ন-সুষমার উপর নির্ভর করে হঠাৎ একদিন বিজয় সতর বছরের বালক শঙ্করের কাছে দাঁড়াল। শঙ্কর তার হাতখানা ধরে পাশে বসিয়ে চুপি চুপি বল্‌লে।

"পত্র লিখ্‌বে" ?

"লিখব।"

"কবিতা পাঠাবে ?"

"পাঠাব।"

"ভুল না !"

"না।"

সেই দিন থেকে শঙ্করের বাক্স কবিতাপূর্ণ হয়ে উঠিল। বিজয়ের বাক্স কেবল তাহার বিনিময়ে শুষ্ক গদ্য জীবনের ভার নিয়ে ফেঁপে উঠতে লাগ্‌ল। একজন কোমল কান্ত কবিত্বময়; আর একজন ভাবুক, প্রেমিক, কবি না হলেও কবিত্বের উপাসক। এমনি ভাবেই উভয়ের মিলটা হয়েছিল।

বিজয় একটু ভাবিয়া বলিল,—তবে এইবার শুনুন,—

"অন্ধ মানস অক্ষম প্রভু !
তোমায় স্বরূপ চিনিতে ;
দেখে নি কখন ; মহিমা তোমার—
পারে নি কখন বুঝিতে।"

শঙ্কর লাফাইয়া উঠিয়া বিজয়ের হাতখানা সজোরে নাড়া দিয়া বলিল —"এইবার অনেকটা হয়েছে !" পরক্ষণেই বসিয়া পড়িয়া বলিল,— "শুনেছ আমার গল্পের বইখানা ছাপাতে দিয়েছি !"

বিজয় ভয়ানক বিস্মিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণে বিষন্নমুখে ক্ষীণ ম্লান হাঁসি হাঁসিয়া বলিল—"বেশ হয়েছে!"

শঙ্কর হাঁসিয়া বলিল—"অভিমান হ'ল বুঝি! কি কর্‌ব বল, নব-প্রভা-প্রেসের সম্পাদক মহাশয় এসে জোর করে ধর্‌লেন, না দিয়ে পার্‌লুম না, তাই তোমাকে দেখাতে পারি নি।"

"আমাকেই বা সব দেখাতে হবে কেন! আমিই বা ও সবের কি বুঝি বলুন!" বিজয় অন্য-মনস্ক-ভাবে কবিতার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

শঙ্কর দুঃখিতচিত্তে বলিল—"ছিঃ বিজয়! ছেলে মানুষী কর না, তোমার কবিতার বইখানা না হয় আমাকে না বলে ছাপাতে দিও।"

বিজয় হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিল—"আপনি কেমন করে টের পেলেন? আমিও সেই কথা ভাবছিলুম—আপনাকে ছাপাবার খবরটা বল্‌তে এসেছিলুম—কিন্তু আপনি কেমন করে জান্‌তে পারলেন?

শঙ্কর ভয়ানক গম্ভীর হইয়া পড়িল।

(২)

"বাবু! একবার দয়া করে পত্র খানা পড়ুন।" একটী রুক্ষকেশ ছিন্নবস্ত্র ধূলিমলিন চৌদ্দবৎসরের বালক আসিয়া শঙ্করের দিকে দীননয়নে চাহিয়া বলিল—"বাবু একবার দয়া করে পত্র খানা পড়ুন না!"

শঙ্কর তাহার কোটরগত জ্যোতিহীন শুষ্ক বড় বড় চক্ষুর দিকে ক্ষণেক চাহিয়া পত্র খানা লইয়া পড়িল। পত্রে লেখা ছিল—

"আমি অভাগিনী, একটী ছেলে ও একটী মেয়ে নিয়ে আজ রোগ শয্যায় পড়িয়া মরিতে বসিয়াছি। আমরা আজ বাদে কাল কি খাইব,

তাহার কিছু সংস্থান নাই। দয়া করিয়া এই পত্রবাহক আমার ছেলের হাতে কিছু ভিক্ষা দিবেন। যদি আমার পত্রে বিশ্বাস না হয় একবার দয়া করিয়া এখানে আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। পরমেশ্বর আপনাদের মঙ্গল করিবেন। ইতি।

অভাগিনী—

হেমাঙ্গিনী দেবী।"

পত্র পড়িয়া শঙ্কর ক্ষণেক চুপ করিয়া কি ভাবিল। পরে বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া বালকের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"এই টাকা নিয়ে আজকে কোন রকমে চালাও,—কাল এস, বুঝ্‌লে? দরকার আছে, বুঝ্‌লে?"

বালক আনন্দের আতিশয্যে ভাসা ভাসা চোখ দুইটীর ক্ষীণ উজ্জ্বল দৃষ্টি শঙ্করের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিল,—"বাবু—বাঁচালেন,—একবার বিশ্বাস যদি না—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বাস হয়েছে—তবে দেখ্‌তে যাব! এখন গোটেই সময় নেই, সন্ধ্যার সময় এস, তখন যাব।"

বালক হাত যোড় করিয়া একটী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

দরজার কাছে মুখ লুকাইয়া একখানা সুন্দর মুখ এই দৃশ্য দেখিতেছিল। ক্ষণপরেই দরজা খুলিয়া গেল। একটী এগার বৎসরের বালিকা নাচিতে নাচিতে শঙ্করের কাছে আসিয়া বলিল—"আমি সকলকে বলে দেব দাদা!"

শঙ্কর হাঁসিয়া বলিল,—"কি বল্‌বি?"

"বল্‌ব—'একটা জোচ্চোর এসে তোমার কাছ থেকে ঠকিয়ে একটা

টাকা নিয়ে গেল।” বালিকা বড় বড় চক্ষু দুইটী দাদার পানে ন্যস্ত করিয়া হাঁসিতে লাগিল।

“জোচ্চোর! বলিস্‌নে বুঝলি?—বল্লে তোর কানের দুল গড়িয়ে দেব না।” শঙ্কর অন্য-মনস্ক-ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

“হ্যাঁ তুমি ত বড় দিলে! সত্যি দাদা, কবে দেবে বল না?

“যে দন তোর বিয়ে হবে সে দিন দেব বুঝলি?”

বালিকা রাঙামুখে পলাইয়া গেল। বিজয় আসিয়া নতমুখে বলিল—“আপনার সময় আছে কি? শেষ প্রূফটা—”

“কে, বিজয়! বস, অন্নপূর্ণাকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি, এর একটা ভাল বর জোগাড় করে দিতে পারিস্‌?”

“কেন পারব না পণ্ডিত মহাশয়! আপনি বলেন ত——” অর্দ্ধপথে থামিয়া বিজয় একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“চেষ্টা দেখ্‌তে পারি।”

শঙ্কর হাঁসিয়া বলিল—“সরল মন নিয়ে কোন কাজে হঠাৎ বিশ্বাস করে বস না, অনেক সময় ঠক্‌তে হয়। আজকাল পণের কথা জান ত! একরাশি টাকা না পেলে কেহই মেয়ে নিতে চায় না। তবে চেষ্টা দেখ্‌তে পার।”

বিজয় হাঁসিয়া বলিল—“মানুষের মন বুঝ্‌তে পারি না, কেন যে তারা সাধ করে—শুধু পয়সার লোভে পরের মনে বিষাদ বেদনা ঢেলে দিতে চায়?”

শঙ্কর তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইয়া বলিল—“বুঝ্‌তে পারবে কি করে বল! রাতদিন কবিতার স্বপ্ন দেখে’—কল্পনারাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসনে বসে, রাজত্ব উপভোগ করলে তো আর সংসারের জ্ঞান হয় না!”

বিজয় হাস্যমুখে বলিল—"আমার দরকার নেই। আমার ভাবনা চিন্তার ভার আপনার উপর থাক্। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা চিরকাল যেন স্বপ্ন-সুষমার মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে রেখে সংসারের বিষাদ স্মৃতিটা আমার কাছে ঘেঁস্‌তে দেবেন না।"

শঙ্কর গম্ভীর হইয়া বলিল—"তবে মনটাকেও কি আমার কাছে চিরকাল বন্দী করে রাখ্‌বে নাকি? শেষটা রাখ্‌তে পার্‌বে?"

বিজয় উত্তেজিত হইয়া রাঙামুখে বলিল—"পার্‌ব—নিশ্চয়ই পারব।"

(৩)

একখানা অন্ধকারময় কুটীর। কুটীরের চারিপার্শ্বে ইতর শ্রেণীর লোকের বাস। সম্মুখে একটা ছোট অপরিষ্কৃত গলি। সেই গলির দুর্গন্ধ-রাশি অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া হারুর সঙ্গে শঙ্কর সেই কুটীরে প্রবেশ করিল।

টাকাটা জুয়াচোরে ঠকাইয়া লইল কি না, তাহার তদন্তে শঙ্কর সেখানে আসে নাই। হারুর মুখ-মণ্ডলের স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহার হৃদয়ে একটা অভিনব ভাবরাশি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। হারুকে ভাল লাগিয়াছে, তাই সে সেখানে উপস্থিত। তাহার কোমল কান্ত হৃদয়ে করুণার একটী ফল্গুপ্রবাহ সদা নিভৃতে বহিয়া যায়, কেহ তাহার বড় একটা সন্ধান জানে না, কিন্তু কেমন একটী অনুকূল আঘাত পাইলেই সেই লুক্কায়িত স্রোত আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। সেদিন হারুর হস্তের সেই পত্রখানা অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ে একটা আঘাতের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। অবশ হইয়া তাই সে হারুর পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিয়াছে।

হারু ঘরে ঢুকিয়া ছিন্ন মলিন শয্যায় তন্দ্রামগ্ন রুগ্ন জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মা! তিনি এসেছেন।"

দুঃখিনী উঠিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল—"আমার অভ্যর্থনার প্রয়োজন নাই। আমি এখানেই বসছি।"

এই সহানুভূতির সম্বাদে দুঃখিনীর চোখে জল আসিয়াছিল। তিনি তাহা কম্পিত হস্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"বাবা! চিরকাল আমার এমন অবস্থা ছিল না, আমি ভদ্রঘরের বধূ, সংসারের তাড়নায় আমার আজ এই দশা, একটী ছেলে ও একটী মেয়ে আমার সম্বল। সব থেকেও আমার কিছু নেই—ভিক্ষা করে খেতে হয়।" দুঃখিনীর সেই শুষ্ক ক্ষীণ মুখমণ্ডল প্রদীপের ক্ষীণ আলোকেও উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

শঙ্কর ব্যথিত হইয়া বলিল--"আমি আপনার ছেলে, আপনার—আর চিন্তা নাই। আমি এখনি ডাক্তার ডেকে আনছি।"

দুঃখিনী তাড়াতাড়ি বলিলেন—"যেও না বাবা! কখন যে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। হারু! শ্যামা! তোরা এদিকে আয়।" দুখিনী তখন ছেলেমেয়ের হাত দুইটী ধরিয়া—শঙ্করের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন—"কিছু মনে কর না বাবা! এদের আর কেউ নেই। আজ থেকে তুমিই এদের রক্ষক হ'লে।"

হারু ও শ্যামা মায়ের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"মা! মা!! আমাদের ফেলে যেও না। আমরা তা' হ'লে বাঁচব না!"

শঙ্করের চক্ষু দিয়াও অশ্রুবারি ঝরিতেছিল। সে তাহা সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিল—"আপনি ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি!"

দুঃখিনী কাতরস্বরে বলিলেন—"ব্যাকুল হ'ব না! তুমি ত জান না বাবা! আমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বলছে! ডাক্তারে কি এ আগুন নিভাতে পার্‌বে? বল বল আমার দান গ্রহণ করলে? মরবার সময় তা' হলে একটু শান্তি পাব।"

শঙ্কর বিষণ্ণ স্বরে বলিল—'দান! আপনি যদি শান্তি পান, তবে আমি স্বীকার কচ্ছি—এদের আমি গ্রহণ কর্‌লুম।"

দুঃখিনী শঙ্করের হাতখানা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"আঃ বড় ঘুম আস্‌ছে! যেন কোথা থেকে কতগুলা শান্তির বাতাস এসে আমার শরীরটাকে অবশ করে তুল্‌ছে। আজ যেন স্বামীর হাঁসিভরা মুখখানা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি! কে যেন আমাকে হাত বাড়িয়ে সুখের সাগরে ভাসাতে ডাক্‌ছে! একি ঘুম?"

শ্যামা সিক্ত চক্ষে ডাকিল—"মা! মা!!"

হারু ব্যস্ত হইয়া বলিল—"চুপ, চুপ, মা ঘুমিয়েছে! অনেক দিন ঘুমোতে পান নি! দে ঘুমোতে দে!"

শঙ্কর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া অশ্রুস্রোতকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

(৪)

শিরোমণি মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কে ডাকিলেন। বিজয় আসিয়া পিতার পাদবন্দনা করিয়া ভূমিতে উপবেশন করিল। পিতা বলিলেন,—"তাঁহাদের বল'—আমরা পণের টাকা একটী লইব না। কিন্তু ৫০ পঞ্চাশভরির অলঙ্কার, খাট, পালঙ্ক, রূপোর এক সেট দানসামগ্রী না দিলে তাঁহাদের কন্যাকেই আমার সামাজে বাহির করা কঠিন হবে। এ ছাড়া তাঁহাদের জামাইকে যাহা দিবার—তাহা ভাল করিয়াই

দিতে হইবে। ইহাতে আমার কিছু স্বার্থ নাই। তাঁহাদের কন্যা জামাতারই থাকিবে, বুঝ্‌লে।”

বিজয় স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণৈক চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরস্বরে বলিল—“দু'বৎসর পরেই না হয় দাদার বিয়ে হ'বে, এখন থাক্।”

“তুমি বল্‌তে পারবে না বুঝি? আচ্ছা আমিই তাঁহাদের বল্‌ব।” শিরোমণি মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া খট্‌ খট্‌ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। বিজয় সেখানে বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ শঙ্কর আসিয়া তাহার হাত খানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল—“ভাব ছিস কি রে বিজয়!”

বিজয় লজ্জিত হইয়া বলিল,—“না কিছু নয়!”

“নিশ্চয় তুই কিছু ভাব্‌ছিলি? সে যা'হ'ক—তোকে একটী ভাল খবর দি', তোর দাদার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ের সমস্ত ঠিক হ'য়ে গেল। তোর সঙ্গে সম্বন্ধটা আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গেল রে!” শঙ্কর প্রসন্ন-মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিজয় অবাক্ হইয়া গেল, তথাপি শঙ্করের দিকে চাহিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল। ছি! ছি!! বাবা তা'হলে কি সমস্ত কথাগুলা পণ্ডিত মহাশয়কে শুনাইয়া দিয়াছেন! পণ্ডিত-মহাশয়ও কি তাতে স্বীকৃতও হয়েছেন? অঁ্যা—পণ্ডিত-মহাশয়ের মনে একটুও ব্যথা লাগে নি? সে নতমুখেই বলিল—“তা'হলে আপনি রাজি হয়েছেন। না হ'লেই হ'ত!” বিজয়ের কথাগুলি বড় করুণস্বরে উচ্চারিত হইল।

শঙ্কর হাঁসিয়া বলিল—“তা'হলে তোকে ত এত নিকটে পেতাম না। কিন্তু তুই ভাব্‌ছিস্ কেন?”

তথাপি বিজয়ের কেমন যেন একটু বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। সে

পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাগ্রহে বলিল—"আপনি তা'হলে খুসী হয়েছেন ?"

"নিশ্চই! তুই যে আমার কত আদরের ছোট ভাই! তা' ত তুই জানিস্ নে। তোদের ঘরে এসে আমার বোনটী যে খুব সুখে থাক্‌বে —তা' তোর পানে চাহিলেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি!"

বিজয় উৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"আপনার বোন্ আমার বৌ-দি! তবে ত খুব ভাল হয়েছে পণ্ডিত মহাশয়!" বিজয়ের মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

শঙ্কর তাহাকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—"চল আমাদের বাড়ীতে—তোকে নূতন মানুষ দেখাব!"

বিজয়ের মুখ খানা ম্লান হইয়া গেল। ধীরে ভগ্ন-কণ্ঠে বলিল—"নূতন মানুষ!"

(৫)

হারুর মাতার মৃত্যু হইয়াছে। শঙ্কর দুঃখিনীর সৎকার করিয়া ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাটীতেই লইয়া আসিয়াছে। হারুর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে।

একদিন হারুকে ডাকিয়া শঙ্কর বলিল,—"তোর বোনের ত একটা বিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তোদের ত ভাল খবর জানিনে, হঠাৎ তোর মায়ের মৃত্যু ঘটে গেল। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসাও কর্‌তে পারি নি। তুই কিছু জানিস্ ?"

হারু চুপ করিয়া কি ভাবিল, পরে বলিল—"জানি না, কিন্তু মা সমস্ত লিখে রেখে গেছেন। মরবার সময় আমাকে সেগুলি দিয়ে বলেছেন

—যে দিন তোর ভয়ানক কষ্ট হবে, যে দিন সংসারে তোর জন্য আর দশজনে কষ্ট পাবে, সে দিন তুই ওগুলা খুলে পড়্‌বি, অন্য সময়ে পড়িস্‌ না—আমার দিব্য রহিল।"

শঙ্কর চুপ্‌ করিয়া কি ভাবিল। পরে বলিল—"কিন্তু না জেনে শুনে ত কেউ পরের মেয়ে ঘরে নিতে চায় না! বড়ই মুস্কিল।"

হারু কি ভাবিয়া বলিল—"কিন্তু মা ত আপনার হাতেই তাকে সঁপে দিয়েছেন? শ্যামার ত আর অন্য জায়গায় বিয়ে———"

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল—"আমাকে সঁপে দিয়েছেন?"

হারু পরিষ্কার স্বরেই বলিল—"হাঁ।"

শঙ্কর সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। সে দিন কৃষ্ণাচতুর্থীর জ্যোৎস্না-রাশি একটু বিলম্বেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্যামা ছাদের উপর বসিয়া আধফোটা জোছনার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া ডাকিল—"শ্যামা!"

শ্যামা চমকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই লজ্জা-নম্র-মুখে দাঁড়াইয়া উঠিল। কিছু বলিল না।

উপরে নক্ষত্রগুলা চিক্‌মিক্‌ করিতেছিল। মেঘের কোলে মুখ লুকাইয়া ক্ষণে ক্ষণে চন্দ্রদেব নিজের কিরণগুলা জগতের কোল হইতে মুছিয়া ফেলিতেছিলেন। আম গাছের আগায় জোনাকি-পোকা-গুলাও ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বসন্তের বায়ু শ্যামার অঞ্চলখানার উপরও অত্যাচার করিতে ছাড়িতেছিল না।

শঙ্কর শ্যামার মূর্ত্তিখানা বড় লক্ষ্য করে নাই। শ্যামা যে দিন দিন কিশোর বয়সের কমনীয় মাধুর্য্যের উপর গা ভাসাইয়া ক্রমেই ফুটিয়া

উঠিতেছিল, তাহা এত দিন এমন করিয়া তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়ে নাই। সে অন্য-মনে বলিল—"কেমন আছ শ্যামা!"

শ্যামা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল—"ভাল আছি।"

শঙ্কর তাহার মুখের দিকে চহিয়া বলিল—"তোমার এখানে কি কষ্ট হ'চ্ছে? তুমি এমন একা একা থাক কেন?"

অতঃপর আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। শ্যামা মাটীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কষ্ট আর কি! তবে মনে হয় আমাদের জন্য আপনাকে কেবল কষ্ট পেতে হয়। ইহাতেই যা' একটু দুঃখ।"

শঙ্কর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"তোমার যদি ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে দিই, তা' হ'লে বোধ হয় তোমার এ দুঃখও থাকে না—নয়?"

শ্যামা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, কিছু বলিল না। শঙ্কর আবার শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল?"

শ্যামা জড়িতকণ্ঠে বলিল—"আমার বিয়ে হবে না।"

"কেন হবে না? আমি যদি চেষ্টা করি, তা' হ'লে বোধ হয় ভাল পাত্র যোগাড় কর্‌তে পারি। কি বল?" শঙ্কর অর্থপূর্ণ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"মা মরবার সময় আমাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছেন। আমার যে আর বিয়ে কর্‌তে নেই। দাসী চাকরাণীর অধিকারেও আপনার বাড়ীতে কি থাক্‌তে পাব না?"

শঙ্কর তাহার হাতখানা ধরিয়া হাঁসিয়া বলিল—"অতটুকু অধিকারে তোমার সুখ হ'তে পারে, কিন্তু আমার তাতে সুখ হবে না—বুঝলে?"

(৬)

"সত্যি বিয়ে হবে ঠাকুরপো !" একটী কিশোরী ব্যাকুলস্বরে সম্মুখস্থ উৎফুল্ল দেবরকে এই কথাগুলি বলিল। কিশোরী—অন্নপূর্ণা।

বিজয় সোচ্ছ্বাসে বলিল—"নিশ্চয় হবে! পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ডেকে নিজে বল্লেছেন। বিয়ের কদিন আমি এখানে মোটেই থাক্‌তে পার্‌ব না।"

অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া বলিল—"আমাকে খবর দিলেন না ?"

'দেবেন বৈ কি ! তিনি এলেন বলে ! আমি তোমাকে আগে সংবাদ দেব বলে দৌড়ে এসেছি। কিন্তু বৌদি ! ক'নে তেমন ভাল হ'ল না, শেষ কালে সেই কুড়িয়ে-আনা মেয়েকে বিয়ে কর্‌বেন !

অন্নপূর্ণা হাঁসিয়া বলিল—"কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে কি ভাল হয় না ঠাকুরপো !"

বিজয় কিন্তু তেমন ভাল কিছু খুঁজিয়া পাইল না। পণ্ডিত মহাশয়ের বিবাহ এমন একটী অভূতপূর্ব্ব মেয়ের সঙ্গে হইবে যে, যাহা কেবল তাহার কল্পনার মধ্যেই বিরাজ করিত। ঐরূপভাবে কুড়িয়ে-আনা ভিক্ষু-কের মেয়ের সঙ্গে তাহার সেই কল্পনাটা এমনি অমিল হইয়া গেল যে, সে স্বস্তি পাইতেছিল না। ভাবিয়াছিল—একবার সেই কথা পণ্ডিত মহাশয়কে বলিবে—কিন্তু কেন জানি না পণ্ডিত মহাশয়ের দিক্ দিয়া স্বার্থত্যাগের ব্যাপারটা তাহার মনে আনন্দ দিতেছিল। তাঁহার সেই করুণাময় হৃদয়টার প্রসার দেখিয়া সে বড় উৎফুল্ল হইয়াছিল—"অ্যাঁ পণ্ডিত মহাশয় এমন !"

সে হাঁসিয়া বলিল—"কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের হৃদয়টা দেখেছ বৌদি !

কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে ভাল হতে পারে; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে তার কোন রকমেই তুলনা হ'তে পারে না!"

পার্শ্ব হইতে শিরোমণি মহাশয় গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"আর তুলনায় কাজ নাই! এবার হ'তে যদি তুই তোর পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী যাবি তবে তোকে ত্যাজ্য পুত্র করব। আর রাত দিন বৌদির সঙ্গে সলাপরামর্শ, আমি অত ভাল বুঝিনে বাপু!"

বিজয় ও অন্নপূর্ণা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শিরোমণি মহাশয় আবার বলিলেন—"ছেলেটার স্পর্দ্ধা দেখ, কোন্ অজাতের মেয়েকে বিয়ে করবেন, আবার সেই কথাটা আমোদ করে বল্‌তে এসেছেন। দেখ বৌমা! ভাইয়ের নামও কর্‌তে পাবে না। কালে কালে ছেলে গুলো হ'ল কি, সমাজ মানে না, ধর্ম্ম মানে না, আমার গৌরবটাও বুঝ্‌লে না!" শিরোমণির মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে ছিল।

বিজয়ের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল—সে শুষ্কস্বরে বলিল—"বাবা! পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন—ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

শিরোমণি কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন! পণ্ডিত মহাশয় তোর ভগবান্, না! আমি বল্‌ছি সেটা অজাতের মেয়ে, আমার অপমান—আমিই তাকে একঘরে করব!" খড়মের শব্দ সেই কর্কশ কণ্ঠস্বরের সঙ্গেই ক্রমে দূর দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল।

বিজয় ও অন্নপূর্ণার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহারা সেখানে নিশ্চল নিস্তব্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

কোথা হইতে শুষ্কমুখে শঙ্কর আসিয়া বিজয়ের গায়ে হাত দিয়া ডাকিল—"বিজু!"

বিজয় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ তুলিতে সাহস হইতেছিল না।

শঙ্কর ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"তোর সঙ্গে আজ শেষ দেখা বিজু! আর দেখা হবে না।"

এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিবার জন্য বিজয় প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ তাহার সর্ব্ব শরীরের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল।

শঙ্কর তেমনি পরিষ্কার স্বরে বলিল—জীবনের প্রারম্ভ হ'তে তোকে বড় ভালবেসেছিলাম—ভাই ছিল না—ভাইয়ের মর্ম্ম তোকে দিয়ে যা বুঝেছিলাম—তার চূড়ান্ত হয়েছে! তবে আসি?"

নীরবে বিজয়ের গণ্ড বহিয়া জলস্রোত বহিয়া যাইতেছিল, কথা কহিবার তার শক্তি ছিল না।

অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল—"শোন্ অন্নপূর্ণা!! আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। এ বাড়ীতে আসা আজ থেকে আমার নিষেধ। আর আমার বাড়ী যাওয়া তোরও নিষেধ! আমার হৃদয় যেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে, সেটাকে জোর করে মিথ্যা ব'লে এ বাড়ীর দরজায় আস্তে আর পারব না। তাতে যতই কেন আমার সর্ব্বনাশ হ'ক না।"

অন্নপূর্ণা শান্তকণ্ঠে বলিল—"এমন কথা বল না দাদা! আমার বিশ্বাস তুমি তোমার নির্ম্মল চরিত্র বজায় রেখে এ বাড়ীতে আবার আস্তে পারবে।"

"তোর কথা হয় ত সত্য হ'তে পারে। তা' বলে স্নেহ প্রীতির উপর নির্ভর করে অপমানিত হতে আমি আর ইচ্ছা করি না। তবে

আসি বোন্।" শঙ্কর বিজয়ের সেই দীন মুর্ত্তির দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

হঠাৎ বিজয় চেঁচাইয়া উঠিয়া সাশ্রুকণ্ঠে বলিল—"পণ্ডিত মহাশয়! পণ্ডিত মহাশয়!" সম্মুখে একখানা চৌকাঠের উপর ঘা খাইয়া সে সেখানে আছড়াইয়া পড়িল।

(৭)

অপরাহ্নের রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া রাঙামুখে ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে হারু আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। গৃহের এই নিস্তব্ধতার ভিতরে কেবল দুইটী প্রাণীর বক্ষের স্পন্দন শব্দ কেবল বাড়িয়া চলিতেছিল।

শঙ্কর ক্ষণপরে বলিল—"ভাব্‌ছিস্ কি হারু! কষ্ট হয়েছে কি?"

হারু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কষ্ট! কই তেমন কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, এখনও ত বেশ হেঁসে-খেলে বেড়াচ্ছি!"

শঙ্কর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তুমি বড় ছেলে মানুষ! সামান্য ব্যাপারে এমন ব্যথিত হও কেন?"

"সামান্য ব্যাপার! জন্মে পিতার মুখ কখন দেখিছি কি না মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় দুটী ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মা আমার ভিক্ষা করে আমাদের মানুষ করেছেন। চক্ষের উপর সেই মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসিছি! তাঁর মনে একটু ও সুখ দিতে পারি নি, শান্তি দিতে পারি নি। তারপর আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, স্বর্গে তুলে ছিলেন। আজ আমাদের জন্যই আপনাকে একঘরে হ'তে হয়েছে, গৃহত্যাগ করতে হয়েছে, স্কুলের পণ্ডিতী পর্য্যন্ত ছাড়্‌তে হয়েছে, আপনার বাড়ী ভাড়ার টাকা কটাকে সম্বল করতে হয়েছে। এই সামান্য ব্যাপারে আবার

দুঃখ! সুখী হওয়াটাই উচিত ছিল! হাঁ—বাড়ীটা বিক্রী' হল?' হারুর চক্ষুর্দ্বয়ের গোল তারকা দুইটী যেন বাহির হইয়া পড়িতে ছিল।

শঙ্কর অতিদুঃখেও তাহার ভাব দেখিয়া হাঁসিয়া ফেলিল, বলিল—"আমার কষ্ট দেখে যদি দুঃখ পেয়ে থাক, তবে সেটা ভুলে যাও। এটাও মনে রেখ এ দুঃখ তোমাদের জন্য নয়। কিন্তু হারু! তুমি যাকে দুঃখ বলে মনে করছ, আমি সেই দুঃখের মধ্যে পড়িলেও তোমার ভগিনীকে পেয়ে যে শান্তি লাভ করেছি—তাতে আমার সমস্ত বিষাদ বেদনা মুছে গিয়েছে। এটা আমার দুঃখ নয়, সৌভাগ্য; বুঝ্‌লে! হ্যাঁ বাড়ী বিক্রীর সমস্ত ঠিক হয়েছে।"

হারু কঠিনস্বরে বলিল—"আপনি মহৎ—আপনার কথা স্বতন্ত্র! কিন্তু আমি আর পারি না! কাল থেকে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, জারজ অপবাদে পাড়ায় বেরুতে পারব না—এটা আমি আর সহ্য করুতে পারি না। বলেন ত মায়ের সেই চিঠিপত্রগুলা খুলে দেখি।"

শঙ্করের চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল, সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, হস্ত মুষ্টি বদ্ধ হইল। সে অনির্দ্দেশ্য ভাবে একদিকে ক্ষণৈক চাহিয়া রহিল ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার সেই ভাব অন্তর্হিত হইল। সে শান্ত হইয়া বলিল—"আরও দু'দিন থাক্।" শঙ্কর ঘর হইতে উঠিয়া গেল। দরজার অপর পার্শ্বে একটী রমণী চক্ষে অঞ্চল দিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সে দৃশ্য শঙ্করের চক্ষে এড়াইল না, সে ধীরে ধীরে তাহার হাত খানা ধরিয়া স্নেহভরে ডাকিল—"কেন কাঁদছ শ্যামা!" শ্যামা তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইতে লাগিল। কিছু বলিল না।

শঙ্কর আবার বলিল—"ছিঃ তুমিও এ সময় যদি কষ্ট পাও, তবে আমি কার মুখের পানে চেয়ে স্থির থাক্‌ব!"

শ্যামা জড়িতকণ্ঠে বলিল—"তুমি শীঘ্র বাড়ী খানা বিক্রী করে ফেল। এদেশে আর আমরা থাক্‌ব না। দিনের মধ্যে একবার শাকান্ন জুঠে সেও ভাল—কিন্তু এ অপমান আর সহ্য হয় না।"

শঙ্কর হাঁসিয়া বলিল—"তাই হ'বে শ্যামা? কিন্তু আরও কিছুদিন এমনি ভাবে এখানে থাকতে হবে! আমি ত শীঘ্র এখান থেকে যেতে পারছি না।"

শ্যামা সাগ্রহে বলিল—"কেন?"

"জান না তুমি! আমার জন্য যে এক খানা হৃদয় আশাপথ পানে চেয়ে উন্মুখ হ'য়ে অপেক্ষা করছে। তার যে সেই উদাসীনের ন্যায় পথে পথে ঘুরে বেড়ান যে আমি চক্ষের উপর দেখ্‌তে পাচ্ছি! তার দেহে লাবণ্য নাই, শরীর শীর্ণ, মুখ পাংশু, দেখা পেয়েও তাকে ডাকি নি, দেখা দিই নি, আদর করি নি, উপেক্ষা করেছি! তার স্মৃতিটাই যে আমাকে দেশ ছাড়া করতে দিচ্ছে না!" এইবার শঙ্করের চক্ষে জল উপ্‌চিয়া উঠিল।

শ্যামা স্বামীর সেই স্নেহভরা আকুল মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে কে যেন ডাকিতেছিল—"পণ্ডিত মহাশয়! পণ্ডিত মহাশয়!!"

(৮)

শিরোমণি মহাশয় অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ বৌমা, অত ভাল নয়! দেওরের সঙ্গে অত গল্প করা আমি মোটেই পছন্দ করি নে।"

শ্বশুরের সম্মুখে অন্নপূর্ণা কোন দিন দাঁড়ায় নাই, বা কোন কথাও

করে নাই। আজ এই অশনিপাতের ন্যায় কঠোর কথাগুলি শুনিয়া —তাহার শরীর যেন হিম হইয়া গেল। তাহার যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইবার মত হইল। সে তাড়াতাড়ি সে ভাব সামলাইয়া লইয়া আজ প্রথম প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"বিজয়কে যে বাবা! আমি ছেলের মত দেখি, সে যে এক দণ্ডও আমা ছাড়া থাকতে পারে না!"

শিরোমণি মহাশয় চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি এত বড় কথা! আমার কথায় প্রতিবাদ! আমার সম্মুখে মুখ তুলে কথা কওয়া! বিনয়! বিনয়! কোথা আছিস্? দেখে যা, বৌমার ব্যাপারটা দেখে যা।" শিরোমণি মহাশয় বিনয়ের অন্বেষণে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণপরেই সেখানে বিনয়ের আবির্ভাব হইল। ক্রোধে তাহার চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কোন কথা না বলিয়া—পায়ের জুতা খুলিয়া অন্নপূর্ণার পৃষ্ঠে সজোরে কয়েক ঘা লাগাইয়া দিল। বলিল—"আস্পদ্ধা কম নয়, বাবার সঙ্গে ঝগড়া! বাড়ী থেকে বের করে দেব জানিস্!"

আঘাতের গভীর বেদনায় অন্নপূর্ণা সংজ্ঞারহিতের ন্যায় সেখানে পড়িয়া গেল। বিনয় একবার ফিরিয়াও দেখিল না—চলিয়া গেল।

দূরে বিজয়ের কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—"বৌদি! বৌদি!!"

অন্নপূর্ণার কর্ণে সে শব্দ পৌঁছিল না। বিজয় তাড়াতাড়ি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া অন্নপূর্ণার গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—বৌদি! বৌদি!!

"একি! বৌদি এমন করে এখানে পড়ে কেন? একি! বৌদি এখানে ঘুমুচ্ছে! না, তা'ত নয়! বৌদি! বৌদি! উঠ, উঠ!!" বিজয় সেখানে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া শুষ্ক মুখে কোন রকমে বলিল—"একি ঠাকুরপো! তোমার মুখখানা অমন বিবর্ণ হয়ে গেল কেন?"

বিজয়ের মুখখানা কেন জানি না হঠাৎ শাদা হইয়া গিয়াছিল. সে ভয়ে ভয়ে বলিল—"তোমার পিঠে ও কিসের দাগ বৌদি!" উঠিয়া বসিবার সময় অন্নপূর্ণার পিঠের সেই আঘাতের চিহ্নগুলা বিজয়ের চোখে পড়িয়া গিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা হাঁসিয়া বলিল—"ও কিছু নয়, অন্যমনস্কে আস্‌তে আস্‌তে আছাড় খেয়ে এই জুতোর উপর পড়ে গিয়েছিলেম, তাই বোধ হয় দাগ হয়েছে।"

বিজয় অন্যমনস্কে বলিল—"হুঁ"

অন্নপূর্ণা তাহার ভাব বুঝিয়া বলিল—"আজ শেষ রাত্রে একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি, তোমাকে বল্‌তে ভুলেছিলাম, শোন—কে যেন আমাকে জোর করে টেনে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে যেন কেবল অন্ধকার, কাহারও সাড়াশব্দ নাই, কোন জন প্রাণীও যেন সেখানে থাক্‌তে পারে না। তুমি যেন আমার কাছে আস্‌বার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছ, এমন সময় কার যেন গলার শব্দ শুন্‌তে পেলাম—খবরদার, তোমার দেওরকে ডেক' না, তার অমঙ্গল হবে, তার সঙ্গে আর কথা কইও না।"

মুগ্ধের ন্যায় বিজয় সেই কথাগুলি শুনিল। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমাকে সকলে ছেড়ে পালিয়েছে, তুমিও কি শেষে পালাবে বৌদি?" বিজয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণা দৃঢ়স্বরে বলিল—"শেষ রাত্রের স্বপন সত্য হয় ঠাকুরপো! তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কইও না।"

"তাই হবে বৌদি! একথা গুলি তোমার রচা নয়, তা' আমার অন্তর আত্মা যেন স্পষ্টকরে জানিয়ে দিচ্ছে! কিছু নিশ্চয় হয়েছে। হউক, পণ্ডিত মহাশয়কে যখন ছাড়্‌তে পেরেছি, তখন তোমার স্নেহের আশ্রয় ও ত্যাগ করতে পারব।" বাষ্পভরে বিজয়ের কণ্ঠ আবদ্ধ হইয়া গেল।

বাহিরে কর্কশকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"হতভাগা! এখানেও মরা কান্না জুড়েছ, আজ থেকে তোমার বৌদির সঙ্গে কথা কহাও বন্ধ হ'ল জান্‌বে।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

(৯)

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে শঙ্কর আজ উন্মত্ত। তাহার অতলস্পর্শী গভীর হৃদয়ের মধ্যে আজ যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার তালে তালে আজ সে হাবু ডুবু খাইতে বসিয়াছে। শৈশবে তাহার পিতা মাতার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহাদের কথা তার মনেও পড়ে না। মায়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার হাতে তুলে-দেওয়া শিশু অন্নপূর্ণাকে নিজের ক্ষুধিত হৃদয়ের সাথী করিয়া লইয়া যখন সে সংসার রঙ্গমঞ্চে সুখের অভিনয়ে উদ্যত, তখন বিধাতার কঠোর অভিসম্পাত তাহার উপর বর্ষিত হইল। যে অভিসম্পাতের ফলে তাহার সোনার সংসার মরুভূমে পরিণত হইল। তাহার হৃদয়ের স্নেহ প্রীতি দিয়ে ঘেরা একটী ক্ষুধিত বান্ধব আজ তাহার জন্য উন্মত্ত, তাহার সঙ্গে তাহার আর মিলনের উপায় নাই। অভাবনীয় এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় রাজ্যের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন কেন? সে কি অন্যায় করিয়াছে! হারুর এই প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণোচিত বদন, শ্যামার এই আপন-ভোলা ত্যাগোজ্জ্বল হৃদয়টা ও কি বিধাতা নীচ বংশের

উপাদানে গঠিত করিয়াছেন ? কখন নয় ! তবে কেন তাহার প্রতি এই নির্য্যাতন ! আজ তাহার আদরের অন্নপূর্ণা তাহারই পাপে মরিতে বসিয়াছে ! সে সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু পারে না কেবল, তাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সংসারের সুখের মুখ দেখিতে চায়, তাহাদের নির্য্যাতন ! তাই আজ সে ব্যথিত, কাতর । ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরের একটা নির্জ্জন কক্ষে শঙ্কর পদচারণা করিতেছিল ।

হারু আসিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল—"এমন অত্যাচার ত আর সহ্য যায় না দাদা !"

"অত্যাচার ! আবার কি অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে হারু ?" শঙ্কর সাগ্রহে হারুর বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

"এই দেখুন—আপনার বাড়ী খানাতেও আর আপনার অধিকার নেই ।" একখানা আদালতের নোটিশ হারু শঙ্করের হস্তে অর্পণ করিল।

"অধিকার নেই ! কেন ? কি জন্য ? আমি আর পড়তে পারি না হারু ! তুই সংক্ষেপে বল্ !" শঙ্করের হৃদয়ের মধ্যে যেন কিসের একটা আলোড়ন চলিতেছিল ।

"আপনার ভগিনী আপনার নামে নালিশ করে এই ডিক্রী পেয়েছেন যে বাড়ী খানি তাঁহার ! আপনার পিতাই নাকি সেই রকম উইল করে-ছিলেন । আদালত আপনাকে সেই বাড়ী দুই দিনের মধ্যে ছাড়তে বলেছেন ।"

"আমার ভগিনী অন্নপূর্ণা ? বেশ হয়েছে হারু ! কি আনন্দের কথা ! আঃ বাঁচলেম, বাড়ী খানার একটা ভাবনা ছিল । সংসার আমার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে হারু ! সব ফরসা !!" শঙ্কর অব্যক্ত যাতনায় বিছানার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল ।

হারু বিষাদ ম্লানমুখে বলিল—"আপনার ভগিনী দ্বারা এটা—"

"জানি জানি—চূর্ণ করে দিও না, ভগিনীকে আমার কাছ থেকে দূরে ফেলে দিও না, তাহার সেই কচি মুখখানা যে এখনও আমার দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছে।"

হারু ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আজ অনুমতি দিন, আজ মায়েব সেই লেখা কাগজটা দেখতেই হবে!"

শঙ্কর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"দেখতেই হবে? আজ বড় কষ্ট, না? আচ্ছা নিয়ে এস! শ্যামা কই! শ্যামা! এদিকে এস, আমার পাশে বস।" অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্যামা আসিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িল।

(১০)

"পণ্ডিত মহাশয়! পণ্ডিত মহাশয়!" বিজয় বিকারের ঘোরে চেঁচাইতেছিল। কয়দিন জ্বরে ভুগিয়া সে আজ বিকারের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। তাহার সুকুমার সুন্দর কোমল হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি চূর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় গিয়াছেন, তাহাদের অত্যাচারে পণ্ডিত মহাশয়কে গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে, ভীষণ কলঙ্ক সাগরে ভাসিতে হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয়েরই ভগিনী তাহার বৌদির সহিত তাহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। সে কত সহ্য করিবে? তাহার কবিতার উৎস এমন করিয়া যে শুখাইয়া যাইবে, তাহা সে মোটেই ভাবে নাই। যে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রেমময় হৃদয়কে জড়াইয়া সে বাড়িয়াছে, সেই পণ্ডিত মহাশয়ের স্মৃতিটা পর্য্যন্ত তাহাকে ভুলিতে হইবে, এ কঠোর আদেশ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? স্মৃতিকে ভুলিতে গিয়া তাহাই যে বড় হইয়া বিরাট মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; সে কি করিবে?

অন্নপূর্ণা আজ জোর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিজয়ের শিয়রে বসিয়া মাথায় বরফ জল দিতেছিল। বিজয়ের মা নাই, আজ সে মায়ের কাজ করিতে বসিয়াছে। আজ আর বাধা বিঘ্ন তাহাকে আটকাইতে পারে নাই।

শিরোমণি মহাশয় আজ কয়দিন পুত্রের খবর লইতেছেন। সমাজ ধর্ম্ম আজ তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ মন্দটাও তিনি ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছেন।

বিকারের যাতনায় বিজয় চেঁচাইয়া উঠিল—"কই! কই!! পালাবেন না, পালাবেন না! আমি কি অপরাধ করেছি, পণ্ডিত মহাশয়!"

অন্নপূর্ণা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঠাকুরপো! পণ্ডিত মহাশয় তোমার আবার আস্‌বেন, তুমি উতলা হইও না।"

"কে বৌদি? তুমি কবে এলে? সেই যে তুমি কোথায় পালিয়েছিলে? সেখান থেকে ত মানুষ ফেরে না, তুমি কেমন ক'রে ফিরলে? সত্যি ফিরেছ, বল না?" আবেগের আতিশয্যে বিজয় উঠিয়া বসিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিলেন।

এমন সময় সেখানে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। হারু ওরফে হারাধন টলিতে টলিতে সেখানে প্রবেশ করিল। অন্নপূর্ণা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া কি একটা যেন অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া বলিল—"দাদা ভাল আছে?"

হারু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"ভাল আছেন—" ক্ষণপরেই বিজয়ের দিকে চাহিয়া সাশ্রুমুখে বলিল—"এ কি? বিজয়দার অসুখ ক'রেছে?"

অন্নপূর্ণার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিজয় যেন কি একটা সম্ভাবনায় উঠিয়া বসিয়া বলিল—"কই! কই!! পণ্ডিত মহাশয় কই? হারাধন বাবু!

আপনি একা এসেছেন?" হতাশ-নয়নে বিজয় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। শরীরের সমস্ত রক্ত তাহার মাথায় উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। হারাধন তাড়াতাড়ি আসিয়া জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিয়া মাথায় বরফজল দিতে দিতে বলিল—"তিনি আস্‌বেন বই কি, তিনি কি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারেন!"

শিরোমণি মহাশয় কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"বৌমা! তোমার ভাইয়ের ঠিকানাটা আমায় দিতে পার? এখনি দাও। এ কি? তুমি এখানে? শঙ্কর কোথায়?" শিরোমণি মহাশয় হারাধনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হারু আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া একটা নমস্কার করিয়া শিরোমণি মহাশয়ের হস্তে একখণ্ড কাগজ দিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিল—"কাগজখানা প'ড়ে দেখুন। ঠিকানা পরে বল্‌ছি।"

সুদীর্ঘ পত্রখানা এক নিশ্বাসে পড়িয়া শিরোমণি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—আঙ্‌টী! আঙ্‌টী!"

হারু নিজের অঙ্গুলি হইতে একটী আঙ্‌টী খুলিয়া শিরোমণি মহাশয়ের হাতে দিল। শিরোমণি চিৎকার করিয়া বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! এত দিন কেন লুকিয়ে ছিলি?" শিরোমণি মহাশয় হারুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"বাবা" "বাবা"! বলিয়া—কাঁদিয়া হারু শিরোমণির বক্ষে মুখ লুকাইল। তখন পিতাপুত্রে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে বিজয় চিৎকার করিয়া ডাকিল—"পণ্ডিত মহাশয়! পণ্ডিত মহাশয়!"

(১১)

হারু বলিল—"বৌদি! বিজয়দা এখন একটু চুপ করেছে, আমার সেই গল্পটা শোন। শুনেছি—বাবার অনেক বিবাহ, আমার মা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আমার মার বাবারা বড় গরীব ছিলেন, আমার মাতামহ বাড়ী ঘর দরজা বিক্রী করে—মায়ের বিবাহ দেন। কিন্তু তবুও আমার পিতার মন পান নি। কখন কখন বাবা আমার মাকে দেখতে যেতেন বটে, সেই যাওয়াতেই আমার মাতামহদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। কুলীনের সন্তানের মর্য্যাদা রক্ষার কথা জান ত। সেই মর্য্যাদা দিতেই মাতামহ অনেক দেনা করেন। আমার যখন দেড় বছর বয়স, তখন একবার বাবার শেষ যাওয়া। তারপর আর বাবা যান নি। এমন সময়ে মাতামহের মৃত্যু ঘটে গেল। পাওনাদাররা—সমস্ত বিক্রী করে আপন গণ্ডা বুঝে নিলে। মা আশ্রয়হীনা হয়ে স্বামীর নিকট খবর পাঠালেন, বাবা তখন বিদেশে ছিলেন—কাজেই মার খবর পেলেন না। মা নিতান্ত অভিমানিনী ছিলেন। তিন বছরের বালক আমাকে এবং একবৎসরের একটী কন্যা শ্যামাকে নিয়ে ভিন্ন গ্রামে গিয়ে রাঁধুনীর কাজ করে আমাদের মানুষ করতে লাগলেন। সেখানেও তিনি বেশী দিন থাকতে পারলেন না।" হারুর চক্ষে জল আসিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা সাগ্রহে বলিল—"তারপর ঠাকুরপো!"

"তারপর আর কি? তারা মায়ের নামে একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে দিলে। সে কথাটা বাবার কাণেও অতিরঞ্জিত হয়ে পৌঁছিল। স্বামীর বাড়ীতে আসবার যা একটু পথ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। মা তখন

দিশেহারা হয়ে—আমাদের নিয়ে এই সহরে এসে লুকিয়ে রহিলেন। এই সহরেরই একজন ভদ্রলোক দয়া করে মাকে কিছু কিছু সাহায্য করতেন। তারপর সেই ভদ্রলোকটীর মৃত্যু হয়, আমাদেরও ভিক্ষা করতে বাধ্য হ'তে হ'ল। তারপর ত সব জান?"

"জানি, কিন্তু তোমার মা এত নিকট থেকেও নিজেকে কেন গোপন করেছিলেন? কেনই বা পরিচয় প্রকাশ কবতে এত দিব্য দিয়ে গেলেন?"

"যদি কখন কদাচিং লুকিয়ে বাবার মুখ দেখতে পান, এই আশায় মার এখানে আসা। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—পিতাই তাঁহার কলঙ্কভঞ্জন করে আবার আদর করে ঘরে তুলে নেবেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সে বাঞ্ছা আর পূর্ণ হয় নি। এই অভিমানবশেই তিনি আমাদিগকেও ভিক্ষুকের মত পরিচয়টা দিতে দিব্য দিয়ে বারণ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ অসহনীয় বিপদই আমাকে বাধ্য করে পরিচয়টা দেওয়াই-য়াছে।"

বিজয় উঠিয়া বসিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল—"তুমি আমার ভাই? কিন্তু তুমি কি নিষ্ঠুর?"

"সত্যি দাদা, এ অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ভাই!" হারু বিজয়ের হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

"বিজয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার প্রাণটা আজ বড় ধড় ফড় কচ্ছে! তোমার সঙ্গে বেশী কথা কইতে পারব না। কিন্তু তুমি একা এলে কেন? পণ্ডিত মহাশয়কে ফেলে এলে কেন?"

হারু বাধা দিয়া বলিল—"তিনি আস্‌বেন। তিনিও তোমার জন্য পাগল! তাঁর হৃদয়টাও—" হারুর কথা শেষ হইল না।

শিরোমণি মহাশয় শঙ্করের হাত ধরিয়া সেখানে আনিয়া বলিলেন—"এই তোমার সেই ছাত্র! তোমার অভাবে তার এই দশা!"

বিজয় তখন চোখ্ বুজিয়া হারুর কথা কয়টা ভাবিতেছিল। পরক্ষণেই উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"কই কই পণ্ডিত মহাশয়!

শঙ্কর তখন তাহাকে কোলে লইয়া বলিল—"এই যে ভাই!

বিজয়ের মুখে আর কথা ফুটিল না।

পূজারী।

(১)

একখানি তালপাতার কুঁড়ে-ঘরে মাটীর মেজের উপর ছিন্নশয্যায় শুইয়া একটী স্ত্রীলোক গোঁয়াইতেছিল। সম্মুখে পুত্র বসিয়া বসিয়া আকুল চক্ষে সেই দৃশ্য দেখিতেছিল—আর কাঁদিতে ছিল। পুত্রের নাম চারুচন্দ্র।

ক্ষণৈক পরে সেই স্ত্রীলোকটী একটু যেন সুস্থ হইয়া সম্মুখস্থ পুত্রের পানে চাহিয়া বলিল,—"আমি আর বাঁচব না বাবা! অনেক আরাধনা করে তোমায় পেয়েছিলাম, তোমাকে একটী কাজের ভার দিয়ে যাব।"

চারু চোখে কাপড় দিয়া অশ্রু মুছিয়া বলিল—"যেও না মা! আর কিছু দিন থাক! আমি তা' হলে বাঁচ্‌ব না।"

জননী হাঁসিয়া বলিলেন—"থাকা না থাকা কি আমার হাত বাবা! আমাকে এ যাত্রা দেখ্‌ছি যেতেই হবে। মর্‌বার সময় তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল না, জীবনে তাঁকে সুখী কর্‌তে পার্‌লাম না, একটু সেবা কর্‌তে পার্‌লাম না—তুমি কিন্তু বাবা তাঁকে ভুল না।"

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে চারু বলিল—"কেন মা! তিনি থাক্‌তেও আমাদের এ দুর্দ্দশা? তোমার এ অবস্থা? একবারও ত দেখ্‌তে এলেন না?"

জননী বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"আমার ভাগ্য, আর তোরও ভাগ্য বটে, জন্মান্তরে যে আমরা পাপ করেছিলাম, তাহার ফলে আজ আমি স্বামী সেবা কর্‌তে পেলাম না, তুইও পিতৃসেবা কর্‌তে পেলি না। কিন্তু

বাবা! আমি গেলে আমার সেবার ভারটা তুই হাতে তুলে নিয়ে—তাঁর সেবা কর্‌বি! কখনও অবহেলা করিস্‌নে।"

চারু কাঁদিয়া বলিল—"মরবার কথা বল না মা! তুমি বাঁচ্‌বে তোমাদের সেবাটা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে মা!"

জননী পুত্রের মাথায় ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তখানি রাখিয়া বলিলেন—"দুঃখ করিস্‌ না চারু! তুই বল—আমার কথাটা রাখবি, আমি তা' হলে সুখে মর্‌তে পার্‌ব। জননীর শেষ কথাটা রাখ্‌!"

চারু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—"আচ্ছা তাই হবে মা! তুমি কিন্তু থাক মা!"

পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া একটী সুন্দরী রমণী সেখানে প্রবেশ করিলেন। রমণীর রূপের জ্যোতিতে সেই কুঁড়ে ঘরও যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেই রমণী রোগিণীর শিয়রে বসিয়া তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইলেন। চারু বিস্মিত-চক্ষে সেই দিকে কেবল চাহিয়া রহিলমাত্র।

চারুর মাতা পুত্রের শেষ কথা কয়টীর মধ্যে কি যেন একটু আনন্দের আভাস পাইয়াছিলেন। তাই তিনি চোখ বুজিয়া সেই ভাবটা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন অন্তিম আহ্বানের ভিতর সুখের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল। রমণী-স্পর্শে সাড়া ফিরিয়া পাইয়া জননী অবাক্‌ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভগবতীর মত অপরূপ রূপ দর্শনে দুঃখিনীর নেত্রে পলক ছিল না।

সেই নবীনা তখন হাসিয়া বলিলেন—"চিন্‌তে পাচ্ছ না দিদি! আমি চারুর কাছে তোমার অসুখ শুনে ছুটে এসেছি! চারু তোমারও যেমন ছেলে, আমারও তেমনি ছেলে!"

দুঃখিনীর চিত্তের মধ্যে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত রকমের ঠেকিতেছিল। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছিলেন না। জমিদার-গৃহিণী চুনিবাবুর স্ত্রী মায়াদেবী আজ তাঁহার শিয়রে আসিয়া আশ্বাসের উল্লাসের বাণীটা ঘোষণা করিবেন—ইহা গরীবের ঘরে বিশ্বাসের কথা কি ?

চারু অশ্রুপূর্ণ নয়নে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—'ইনিই মা! সেই দেবী! আমাদের আর ভাবনা নেই।"

দুঃখিনী আনন্দের আতিশয্যে উঠিয়া বলিলেন—"দিদি! দিদি! আমার চারু আজ—" দুঃখিনীর কথা শেষ হইল না। মূর্চ্ছিতা হইয়া অন্নপূর্ণার কোলে পড়িয়া গেলেন।

(২)

মুখুয্যে পাড়ায় চারুচন্দ্রের বাস। চারু বিনোদপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। চারুর পিতা আছে, বিমাতা ও বৈমাতৃক ভ্রাতা ভগিনীও আছে। কুলীনের সন্তান বলিয়া—নবীন মুখুয্যে প্রথমা পত্নী থাকিতেও আরও একটী বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা দরিদ্রের কন্যা, এইজন্য সপত্নী ও স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া—দশজনের সাহায্যে সেই গ্রামের প্রান্তে একটী কুটীরে বাস করিতেন। স্বামীসহবাস তাঁহার কপালে বড় ঘটে নাই, অবশ্য সেজন্য তিনি নিজের অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া প্রত্যহই অনুদ্দেশ্য স্বামীর পূজা করিতেন। শুধু স্বামীর স্মৃতিটুকু লইয়া আর তেত্রিশকোটী দেবতার নিকট স্বামীর কল্যাণকামনা করিয়া সেই ক্ষীণ জীবনকেও সতেজ করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক দেবতার নিকট মানত করিয়া তিনি চারুকে [illegible]ছিলেন, পাইয়াও কিন্তু দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারিলেন না; চারুকে

শোকের সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। থাকিল কেবল স্মৃতি! এই স্মৃতিটুকুই চারুর সম্বল।

সেদিন চুণিবাবু সকালে চারুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। চারু বিনীত বেশে নম্রভাবে আসিয়া নমস্কার করিল। এবং সাকাঙ্ক্ষ নয়নে চুণিবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

চুণিবাবু বলিলেন,—"চারু! শুনলাম তোমার পিতা নাকি তোমায় ভালবাসেন না?"

চারু বিস্মিত হইয়া বলিল,—"আজ্ঞে কই—বল্‌তে পারি না!"

চুণিবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন,—"শুনেছি তুমি পিতার কাছে চাকরের ন্যায় থাক, তোমার পিতা ও বিমাতা ঘরে থাক্‌তে দেন না! এ সব কি স্নেহের পরিচয়?"

চারু কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

চুণিবাবু আদর করিয়া বলিলেন—"তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে?"

চারু কৃতজ্ঞ-নয়নে বলিল—"না।"

চুণিবাবু দুঃখিত চিত্তে বলিলেন—"তোমার কি এই অত্যাচার সহ্য করা উচিত? পিতা যখন নিজ কর্ত্তব্য করলেন না, তখন তুমি কেন নিজের জীবনটাকে অবসাদের মধ্যে রেখে আপনার ক্ষতি কর?"

চারু ব্যথিত হইয়া বলিল—"আমি কিছু অবসাদ বুঝ্‌তে পারি না, আমার এখানে থাকা হবে না। আমি বাবার কাছেই থাক্‌ব।"

চুণিবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"চল তোমার পিতার নিকট যাই, দেখি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

চারু ভগ্নস্বরে বলিল,—"আপনি আমার সম্বন্ধে বাবার নিকট কিছু

বল্‌বেন না। তাঁহার একটু অসন্তোষেও আমার মায়ের নিকট অপরাধী হ'তে হবে।" চারু—শূন্যদৃষ্টে পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

চুণিবাবু অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া চারুর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

পার্শ্ব হইতে কে চিৎকার করিয়া ডাকিল—"হতভাগা! কাজকর্ম্ম নেই, এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে?"

"যাই বাবা!" বলিয়া চারু পিতার সমীপে ধীরপদে উপস্থিত হইল।

নবীনচন্দ্র চারুর কাণটা ধরিয়া একপাক ঘুরাইয়া বলিলেন—"তোর জন্য কি আমাদের সমস্ত কাজ বন্ধ কর্‌তে হবে নাকি? দেখ্‌গে যা, বাড়ীতে এখনও গরু বাছুর খেতে পায় নি! হতভাগা তোকে খুঁজে বেড়াবার জন্যও কি একজন লোক রাখ্‌তে হবে না কি? পাজি! নচ্ছার! পাষণ্ড!!"

চারু ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইল। তাহার কাণের বেদনার কথাটা পর্য্যন্ত তাহার মনে ছিল না।

সম্মুখের দ্বিতল প্রকোষ্ঠের খড়খড়ির অন্তরালে একখানা স্নেহভরা করুণ মুখ এই দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু মুছিতেছিল। সে মুখখানি মায়াদেবীর।

(৩)

মাঘ মাস, শ্রীপঞ্চমী আগত প্রায়। বসন্ত সমাগমে যেন প্রকৃতি দেবী নব সাজে সজ্জিত হইয়াছেন। শীত ঋতুর প্রভাব ম্লান হইয়া জড়তা অবসাদকে দূরীভূত করিয়াছে। নূতন জীবনের বাণী যেন' জগতের এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিঘোষিত হইতেছে। তোমরা জাগ! জাগ। সরস্বতী জননী আসিতেছেন, তোমরা সকলে নূতন জীবনের জন্য প্রস্তুত হও, আশা উল্লাস নিয়ে মায়ের আরাধনার সঙ্গে নূতন শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হও।

এমনি একদিনে একদিন মায়াদেবী ডাকিলেন "চারু!"

চারু একখানা ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনে কি দেখিতেছিল, সে অন্নপূর্ণার আহ্বান শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল—"কি মা!" সদ্যঃস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা পট্টবস্ত্রপরিধানা মায়াদেবীকে তখন দেবীর মতই দেখাইতেছিল।

তিনি বলিলেন—"সরস্বতী পূজা ত এলো বাছা! পূজার যোগাড় ত করতে হয়।"

"পূজার যোগাড়! আচ্ছা মা! আমিই সব করে দেব! কিন্তু মা! আমি ত থাকতে পারব না!"

মায়াদেবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন?"

চারু হেঁট মুখে বলিল—"আমাদের বাড়ীতে বরাবর পূজা হয়! ছেলেবেলায় এই পূজার দিনে বাবার পায়ের ধূলা নিয়ে মা আমার হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, সেই দিন থেকে প্রতি বছরই বাবার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে হয়।"

"মায়াদেবী ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"তোমার ত বাছা সে বাড়ীতে যেতে বারণ আছে। তবে তুমি কেমন করে যাবে?"

চুণিবাবু একদিন চারুর পিতা নবীন বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছিলেন। চারুর প্রতি তাহার পিতার অযথা ব্যবহারটা তাহার সহ্য হয় নাই, এইজন্য এই বিবাদ। তাহার ফলে চারু গৃহ-তাড়িত হইয়া

চুণিবাবুর আশ্রয়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজ শ্রীপঞ্চমীর পূজার সংবাদে শৈশবের সেই পুরাতন কাহিনীগুলা চারুর প্রাণের মধ্যে একটা ভাবের তরঙ্গ চালিয়া দিয়াছিল। সে সব ভুলিয়া পিতার সেই শুভ স্বস্তিবাণীর মধুর মন্ত্র-রবটাই শুনিতে পাইতেছিল; কিন্তু সেই স্বস্তিবাণী যে তাহার প্রাণের মধ্যে আর অমৃত বর্ষণ করিবে না, এটা তাহার মনেও ছিল না, আজ মায়াদেবীর কথায় তাহার প্রাণ খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল—জগৎটা শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে তখন সেখানে বসিয়া পড়িয়া বিষাদমাখা চোখ দুইটা মায়াদেবীর দিকে তুলিয়া ধরিল। মায়াদেবী আর কিছু বলিলেন না, কি একটা ভাবিয়া স্বামীর কাছে চলিয়া গেলেন।

প্রবোধ আসিয়া চারুর হাতখানা ধরিয়া টানিয়া বলিল—"চল না দাদা! আমাদের ঠাকুর গড়া দেখ্‌তে যাই!" প্রবোধ চুণিবাবুর ছেলে।

চারু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া বলিল—"চল ভাই!"

প্রবোধ বলিল—"তুমি অত বিষণ্ণ হয়ে থাক কেন দাদা!"

চারু কাষ্ঠ হাঁসি হাঁসিয়া বলিল—"বিষণ্ণ কেন যে হই, তুমি কেমন করে বুঝ্‌বে ভাই! আমার একটা স্নেহের রাজত্ব ছিল, আমার একটা কল্যাণের—আশীর্ব্বাদের দেবতা ছিল; কপালদোষে সেই দেবতার চরণ ছায়া ছেড়ে আসতে হয়েছে! শুধু তাই নয় ভাই! আমার মায়ের অন্তিম আদেশও বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে।" অশ্রুভরে চারুর কপোলদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠিল!

প্রবোধ চারুর সেই প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বড় ব্যথিত হইয়া পড়িল।

(৪)

সেদিন সন্ধ্যা করিতে বসিয়াই—নবীনচন্দ্র রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন —"আমি যদি ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিত ক'রে থাকি'—তবে তার কখন ভাল হবে না, গ্রামের জমীদার হ'য়ে ব্রাহ্মণকে গালাগালি! পাষণ্ড! বেল্লিক!"

সম্মুখে ছাতাপড়া সিংহাসনের উপর চন্দনের লেপনে স্থূলাকার শাল-গ্রাম শিলায় বিশ্বরূপী নারায়ণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। চারিদিক্ অপরিষ্কৃত—অপরিচ্ছন্ন। দেওয়ালের গায়ে কতগুলা ঝুল, শালগ্রামের সিংহাসনেও ঝুল,—পূজা পাত্রও ততোধিক অপরিষ্কৃত। নারায়ণদেব যেন নবীন-চন্দ্রের সেই ক্ষুদ্র ঘরে আসিয়া বিশ্বের জঞ্জালগুলির মায়াও ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী ফুলকুমারী এক ছটাক ছাতাপড়া আলোচাল জলে ভিজাইয়া—একখানা ক্ষুদ্র পিত্তলের পাত্রে ভাগ করিয়া নৈবেদ্য করিতে করিতে বলিল—"শুধু চুণিলালবাবুকে দোষ দিলে চল্‌বে কেন? তোমার সেই গোবরগণেশ হতচ্ছাড়া ছেলেটার ঠ্যাকার দেখ্‌ছ?"

"দূর করে দাও, তার আর মুখও দেখ্‌ব না" নবীনচন্দ্রের সন্ধ্যাহ্নিক দ্রুত চলিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"জ্যেঠা মহাশয়! আছেন কি?"

বড় মিষ্ট স্বর! নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন—একটী সুন্দর সুকুমার কিশোর বয়সের বালক চাকরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বালক আবার বলিয়া উঠিল—

"আপনি বুঝি জ্যেঠা মহাশয়! মা বলেছেন—আপনই ত জ্যেঠামহাশয় না?" বালক মধুর হাঁসিয়া নবীনচন্দ্রের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিল।

নবীনচন্দ্রের সন্ধ্যাহ্নিক-পূত প্রাণটায় কেমন যেন একটা গোলমাল বাধিয়া গেল। যে শুষ্ক ভাবহীন আচারের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রাণটা কেবল কর্কশ কঠোর হইয়া উঠিতেছিল। আজ প্রবোধচন্দ্রের এই আহ্বানে সেখানে যেন একটা স্নেহের ফল্গুপ্রবাহ বহিয়া গেল। তিনি স্নেহভরে ডাকিলেন—

"তোমার নাম কি বাবা?"

প্রবোধচন্দ্র বড় গলা করিয়া হাসিয়া বলিল—"আপনি আমার নাম জানেন না—জ্যাঠামহাশয়! আমি প্রবোধ! আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত চুণিলাল চট্টোপাধ্যায়—আমার মার নাম——"

"থাক্ বাবা, আর বল্‌তে হবে না!" নবীনচন্দ্র বিষণ্ণ চক্ষে একবার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

প্রবোধ সরিয়া আসিয়া নবীনচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উন্মুখ হইয়া বলিল—"জ্যাঠামহাশয়! আমাদের বাড়ীতে আপনাদের সরস্বতী-পূজার নিমন্ত্রণ, মা বিশেষ করে যেতে বলে দিয়েছে!"

"চুপ, চুপ! আমি কাল——তুমি এখন যাও বুঝ্‌লে?"

"যেও যেও জ্যাঠামহাশয়! তা না হলে বাবা রাগ করবে, মা রাগ করবে—মা সরস্বতীও রাগ করবেন!" প্রবোধ স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া চলিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র একদৃষ্টে সেই বালকের পানে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রাণ যেন ছুটিয়া কোথায় চলিয়া যাইতে চাহিতেছিল। সেখানে যেন কত বাধা, কত বিপত্তি!

পিছন হইতে ফুলকুমারী কর্কশকণ্ঠে ডাকিল—"বলি পূজা করবে না! বেলা যে গেল! তোমার জন্য কি আমাদেরও পেটে চড়া পড়বে নাকি?"

নবীনচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—"এই যে—আচ্ছা আমি পূজোটা খুব শীঘ্র সেরে নিচ্ছি!" নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া পূজায় বসিলেন। সেদিন কিন্তু তাঁহার পূজাটা শীঘ্র না হইয়া বড় বিলম্বেই সমাধা হইল।

(৫)

সে দিন সন্ধ্যার সময়ে চারু প্রবোধকে সঙ্গে লইয়া মায়াদেবীর ক্রোড়ের ধারে উপবেশন করিয়া নক্ষত্রগুলার শুভ্র কিরণে অভিস্নাত হইতেছিল। কাল বাসন্তী পঞ্চমী, পূজার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত, সকলেই নিশ্চিন্ত।

ক্ষণেকপরে চারু উচ্ছ্বাস-ভরে বলিল- "বল্ দেখি প্রবোধ! ওটা কি?"

প্রবোধ। "কোন্‌টা দাদা?"

চারু। "ঐ যে আকাশের গায় একটা বড় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদিগের দিকে চেয়ে রয়েছে! ওটা কি বল্ দিকি?"

প্রবোধ। "ওটা ত একটা নক্ষত্র দাদা!

চারু। "তা' নয়রে প্রবোধ! ওর মধ্যে আমার মা বসে আমার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে দেখ্‌ছেন। যেন, মা আমাকে বল্‌ছেন—দেখিস্ চারু! আমি তোর বাপকে ছেড়ে এসেছি! তার যেন কষ্ট না হয়! আমি তাঁর কোন দিন সেবা করতে পারি নি—তুই যেন তাঁকে কোন দিন ভুলিস্ নে। তিনিই তোর স্বর্গ, তিনিই তোর ইহপরকালের

সব !” কথা বলিতে বলিতে চারু মনে যেন কিসের একটা কম্পন অনুভব করিল, চক্ষের জলও বুঝি সেই কম্পনের বেগ অনুভব করিয়াছিল, তাই গড়াইয়া আসিয়া তাহার গণ্ডের উপর স্বচ্ছ মুক্তা পংক্তি উপহার দিল।

মায়াদেবী বিস্মিত হইয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন—“চারু !”

চারু ভয়ানক লজ্জিত হইয়া পড়িল—মায়াদেবীর দিকে চাহিতে পারিল না।

মায়াদেবী স্নেহভরে বলিলেন—“হ্যাঁরে চারু ! তোর কি এখানে বড় কষ্ট হচ্ছে ?”

“কষ্ট আর কি মা ? বাবাকে ছেড়ে এসেছি তাই !” চারু মাথা-নীচু করিয়া কথা গুলি বলিল।

মায়াদেবীর মনে একটা আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি চারুর অন্তঃকরণটার ভিতর এমন করিয়া কোন দিন তলাইয়া বুঝেন নাই। ছি ছি ! এই বালককে পিতার দুঃখময় ক্রোড় হইতে সরাইয়া আনিয়া কি অন্যায় কার্য্যই না করা হইয়াছে। সন্তানের কাছে পিতা চিরকালই উপাস্য, তিনি হাজার কেন মন্দই হউন না। তিনি আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ক্ষণৈকপরে চুণিবাবু আসিয়া চারুর মাথায় হাত বুলাইয়াবলিলেন,—“বাবাজী ! তোমার বাবাকে আজ খুব শুনিয়ে দিয়েছি !”

চারু চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল—“শুনিয়ে দিয়াছেন ?”

“হাঁ, তুমি কিছু ভেব না, আমি থাকতে তোমার কেশস্পর্শও কেউ কর্‌তে পার্‌বে না ?”

চারুর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—সে অতিকষ্টে সে ভাব সামলাইয়া বলিল—"আমি আজই বাড়ী যাব! বাবা তাড়িয়ে দিলেও আমি কোনরকমে সেখানেই থাক্‌ব।"

চুণিবাবু অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রবোধ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া চারুর কোলের উপর বসিয়া পড়িয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিল—'তা' হবে না দাদা! কাল পূজা, কাল তোমাকে থাক্‌তেই হবে।"

চারু প্রবোধকে আদর করিয়া বলিল—"না ভাই! আজ আমার মনটা বড খারাপ হয়েছে—আমি বাবাকে একবার না দেখে মা সরস্বতীকে অঞ্জলি দিতে পারব না।"

প্রবোধ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া চুণিবাবুর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবা! তা' হ'লে পূজা হ'বে না বল্‌ছি, দাদা না থাক্‌লে হ'তেই পারে না।"

চুণিবাবু সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তাই হবে, চারুর সত্যিকার পূজাটার আগে যোগাড় করে দি। তারপর মাটীর ঠাকুরের ব্যবস্থা করা যাবে।" চুণিবাবু সেই রাত্রেই অন্তর্হিত হইলেন।

(৬)

শনিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি, মণ্ডপ আলোকরা প্রতিমার পূজার আয়োজন হইয়াছে। সাত্বিক পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসিয়াছেন। থরে থরে কুন্দ, পলাশ প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পশ্রেণী পুষ্পপাত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল প্রভৃতির গন্ধে চারিদিক আমোদিত। মায়াদেবী আজ 'অন্নপূর্ণা' মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। মা মা রবে চারিদিক্ মুখরিত।

একটা আনন্দোচ্ছ্বাস-মিশ্রিত কলকণ্ঠের অভিব্যক্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

পূজা শেষ হইয়াছে পুরোহিত মহাশয় অঞ্জলি দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। পাড়ার একপাল ছেলেরা পুরোহিত ঠাকুরকে ঘিরিয়া ফুল লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সেই শিশুদিগের কলকণ্ঠনিঃসৃত উল্লাসধ্বনির মধুর উচ্ছ্বাসে মাতৃপ্রতিমাও যেন সজাগ হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

চারু কিন্তু সেখানে ছিল না। মৃণ্ময়ী প্রতিমার ভিতরে সে কি একটা ভাব খুঁজিয়া না পাইয়া—একটা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া কি করিতেছিল।

মায়াদেবী তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইতেছিল—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

মায়াদেবীর চক্ষে জল আসিয়াছিল। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালকের এই একের মধ্যে সর্ব্ব দেবতার পূজা প্রত্যক্ষ করিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

ক্ষণপরেই গৃহ দ্বার খুলিয়া গেল। চারু বাহিরে আসিয়া মায়াদেবীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বড় লজ্জিত হইয়া পড়িল বলিল—"চল মা! এই বার অঞ্জলি দিয়ে আসিগে।"

মায়াদেবী বলিলেন—"চল বাবা!"

তখন পুরোহিত মহাশয় বলিতেছিলেন—

"ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।"

তখন পূর্ণ মনে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে চারু ও প্রবোধ বলিল—

"ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥"

মধুর দৃশ্য! সেই মধুর ভাব আর সেই মন্ত্রের মধুর গাম্ভীর্য্য যেন কত মনের মালিন্য ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গেল। চারু ও প্রবোধ মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল।

কে যেন ডাকিল—"চারু!"

চারু মস্তক তুলিয়া দেখিল—তাহার পিতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্নেহ স্বরে ডাকিতেছেন। সে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ সেই পিতৃচরণে লুঠাইয়া দিল।

প্রবোধ পার্শ্ব হইতে চেঁচাইয়া বলিল—"জ্যেঠামহাশয়! জ্যেঠা মহাশয়!"

পশ্চাতে চুণিবাবু—নবীনচন্দ্রের পায়ে ধরিয়া নিজের অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে ছিলেন।

পরাজয়।

(১)

"রামেশ্বর! রামেশ্বর!" মেসের দ্বিতল গৃহের বারান্দা হইতে সুশীল আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে চাকরকে ডাকিল।

নীচে হইতে উত্তর আসিল—"বাবু!"

"চিঠির বাক্সটা দেখ্ ত, কোন পত্র আছে কি না!" সুশীল নীচের দেওয়ালের গায়ে বসান একটী কাঠের বাক্সের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল।

চাকর বলিল "কিছু নেই বাবু!"

সুশীল হতাশ হইয়া বলিল—'কিচ্ছু নেই!"

চাকর বলিল—'না!"

সুশীল বিষন্নমনে যাইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। 'আজও পত্র দিলে না! সে ত এমন করে না, দিনে তার একখানা পত্র না লিখিলে যে চলে না, আজ সাত দিন একখানাও পত্র নাই! ভগবান্ বলে দাও তার কি হল!' সুশীলের চিন্তার শেষ নাই। সন্ধ্যারাণীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখমণ্ডলের বিষাদ কালিমা সুশীলের মনেও একটা নিবিড় দুঃখের স্পর্শ টাও বুলাইয়া দিয়া গেল। দক্ষিণের জানালা দিয়া মৃদুমন্দ বায়ু আসিয়া তাহার কুঞ্চিত কেশের উপর একটা স্বস্তির—শুভ সান্তনার বারতা জানাইয়া দিয়া গেলেও সে কিন্তু তৃপ্ত হইতেছিল না।

মেসে তখন কেহ ছিল না। সকলেই বেড়াইতে গিয়াছে। একা

সুশীল কেবল কাহার সুন্দর কিশোর মুখখানা হৃদয়ের মধ্যে কল্পনার সাহায্যে চাপিয়া ধরিয়া স্বপ্ন স্রোতের মধ্যে ভাসিতেছিল, কখন তরঙ্গ হিল্লোলে উঠিতেছিল—কখনও বা নামিতেছিল।

চাকর আসিয়া ডাকিল—"বাবু!"

সুশীল ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"কি কি রামেশ্বর!"

"এই পত্র।"

সুশীল লাফ দিয়া উঠিয়া রামেশ্বরের হস্ত হইতে পত্রখানা কাড়িয়া লইল। ক্ষণৈকপরে মুখখানা পাংশুবর্ণ করিয়া বলিল—"পোষ্টকার্ড যে!"

"হাঁ বাবু! পোষ্টকার্ডই এসেছে"

সুশীল বিরক্তস্বরে বলিল—"আলো জ্বেলে দিয়ে তুই এখন যা!"

চাকর বাতি-দানে আলো জ্বালাইয়া প্রস্থান করিল। সুশীল পত্র পড়িল। পত্রে লেখা ছিল,—

"পরম মঙ্গলাস্পদেষু

বাবা সুশীল! তুমি পত্র পাঠ মাত্র বাড়ী চলিয়া আসিবে, বিলম্ব করিও না। বধূমাতার আজ সাত দিন জ্বর হইয়াছে, সেজন্য ভাবিত হইও না। আসিবার সময় কিছু ডালিম বেদানা লইয়া আসিবে। ইতি আশীর্ব্বাদক তোমার পিতা—শ্রীহরিহর রায়।"

পত্রখানা হঠাৎ অশনির মত সুশীলের হৃদয়ে আসিয়া পড়িল। সে নিশ্চল নিথর হইয়া মরার মত শয্যায় পড়িয়া রহিল, চাকর আসিয়া ডাকিল—"বাবু! ভাত হয়েছে!"

সুশীল চমকিত হইয়া বলিল—"সে কিরে! আমার যে সাত দিন অসুখ! ভাত খাব কি রে?"

চাকরও ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি বাবু! আপনার ত কিছু হয় নি! সকালেও ত ভাত খেয়েছেন ?"

সুশীল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"যা, একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়, আমি বাড়ী যাব, ভাত খাব না" সুশীল মোট মাট বাঁধিতে সুরু করিয়া দিল।

চাকর ভাবিল—'বাবুর নিশ্চয় মাথাটী খারাপ হয়েছে!'

(২)

হরিপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত কালীকান্ত রায় মহাশয় প্রাতঃকালে বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। বারান্দার সম্মুখে বিস্তৃত ফুলবাগান - বাগানের শেষপ্রান্তে সদর দরজা। বাড়ীর চারিদিকই বিস্তৃত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

কালীকান্ত বাবুর পুত্র রমাকান্ত আসিয়া বলিল—'তা' হলে আমি আজই যাই। নিলামের আর এক সপ্তাহ বাকি, এর মধ্যে তাদের না সরাতে পারলে কোনই সুবিধা হবে না।"

কালীকান্তবাবু রক্তচক্ষে বলিলেন—"এত বড় আস্পর্দ্ধা! হরিহর জানে না যে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠা অসম্ভব। দেখ, মনে থাকে যেন, হরিহরকে এই আঘাতেই কাবু করা চাই।"

পুত্র বলিল—"নিশ্চয়ই!" পরক্ষণেই সে অন্তর্হিত হইল।

হরিপুরে দুই ঘর প্রতাপশালী জমীদার বাস করিতেন। একজন হরিহর রায়, অপর কালীকান্ত রায়! হরিহর অপেক্ষা কালীকান্ত ধনে মানে বড় হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটা বড় পরিষ্কার ছিল না।

এইজন্য তাঁহার প্রজারাও বড় বাধ্য ছিল না। বাজে ব্যয়ও তাঁহার যথেষ্ঠ ছিল। এদিকে হরিহরের অমায়িক-স্বভাবে প্রজাবৃন্দ সমস্তই বশীভূত; ইতর ভদ্র সকলেই বিমুগ্ধ। বিশেষতঃ তাঁহার মিতব্যয়িতার ফলে লক্ষ্মীশ্রী দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীকান্ত কিন্তু অন্তরে হিংসার দাবদাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিতেছিলেন। এই দুই জমীদার লইয়া গ্রামের মধ্যে একটা ছোট বড় দলাদলিও যে চলিত না এমন নহে; কিন্তু সেদিন দুর্গোৎসবের সময় কালীকান্তের দলটা এতই ছোট হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি তদবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যেমন করিয়াই হউক হরিহরকে খর্ব্ব করিতে হইবে। আজ তাহারই প্রথম সূচনায় পিতা পুত্রের আলাপ হইয়া গেল।

প্রভাতের রক্তিম তরুণ অরুণকে বুকে করিয়া ইচ্ছামতী নদীর অন্ধকার মূর্ত্তি যখন হাঁসিয়া উঠিল, যখন নদীতীরের গাছপালার মধ্যে নানা পক্ষীশ্রেণীর অস্ফুট কোলাহলে ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল—তখন রমাকান্ত আসিয়া নদীতীরের একটা নিভৃত স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এক মুহূর্ত্ত পরে একটী প্রৌঢ়া রমণী অঞ্চল দুলাইয়া সেখানে আসিয়া হাঁসিয়া বলিল,—"সে হবে না বাবু!"

"কেন হবে না হরিমতি!" ব্যাকুলনয়নে রমাকান্ত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিমতী মাথার কাপড়খানা তুলিয়া দিয়া বলিল—"সে তেমন মেয়ে নয়, বিধবা হ'লেও তাহার সতীত্ব যেন ফুটে পড়ছে। কি বলব বড় বাবু! তার রূপের কথা নিয়ে, তার নূতন যৌবনের কথা নিয়ে দু'টো আশা অকাঙ্ক্ষার কথা তুলে যেমন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি, অমনি সে

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে আমাকে তিরস্কার কল্লে। আমি আর অন্য কথা কইতে পারিনি।"

বড়বাবু উষ্ণ হইয়া বলিলেন—"এক দিনে হবে না হরিমতি! আজ কিছু টাকা নাও। বরাবর চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। হ্যাঁ একটা কাজ কল্লে হয় না?" রমাকান্ত অন্যমনস্কে একটা গাছের পাতা ছিঁড়িতে লাগিল।

"কি কাজ বাবু!"

"কাজ বেশী কিছু নয়, কোন রকমে হরিহরবাবুকে সরাতে হবে, আচ্ছা আমিই তার উপায় দেখ্‌ব। তুমি সুশীলের শাশুড়ীর অসুখ হয়েছে বলে রটিয়ে দিও। সেখান থেকে টেলীগ্রাফ আস্‌বে। তা' হলে সুশীলের বাপ্ তাহার পুত্রবধূকে নিয়ে রামপুরে নিশ্চয় যাবেন, কারণ সেখানে সুশীলের শাশুড়ীর আর কেউ নেই যে মেয়ে নিতে আস্‌বে। বুঝ্‌লে! তার পর আর সব আমি গুছিয়ে নেব।"

হরিমতী বিষণ্ণ হইয়া বলিল—"দেখ বাবু! আমি গরীব, আমার যেন সর্ব্বনাশ না হয়।"

রমাকান্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ভয় নেই, আমি থাক্‌তে কেউ তোমার কেশস্পর্শও কর্‌তে পারবে না।" রমাকান্ত হরিমতীর দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া নদীতীরে নৌকার অন্বেষণে চলিল।

(৩)

সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগ্বধূ ম্লান হইয়া নিজের অবগুণ্ঠনটা বড় করিয়া টানিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সূর্য্যদেবের অদর্শন ভয়ে বিরহাতুর মুখখানাকে কালী করিয়া দিবারাণী যেন কোন অজানা জায়গায় লুকাইয়াছেন। চারিদিকেই ম্লানতার চিহ্ন পরিস্ফুট।

এমন সময়ে দ্রুতপদে হরিহর বাবু অন্তপুরে প্রবেশ করিলেন, ডাকি-লেন—"বৌমা! বৌমা!"

একটী সুন্দরী কিশোরী গৃহ হইতে বাহির হইয়া শ্বশুরের পাদবন্দনা করিয়া বলিল—"কি বাবা!"

"এখনি ত মা! তোমার বাপের বাড়ী যেতে হয়! তোমার মার বড় অসুখ, টেলিগ্রাফ এসেছে!" হরিহর বাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

সেই কিশোরী রমণী বিবর্ণ হইয়া বলিল—"টেলিগ্রাফ এসেছে! মায়ের অসুখ! হরিমতীও এই কথা বল্‌ছিল।"

হরিহর বাবু তাড়া দিয়া বলিলেন—"গুছিয়ে নাও মা! এখনি যেতে হবে।" হরিহর বাবু ব্যস্ত হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। কিশোরী রমণী কিন্তু নড়িলও না বা কিছু করিবার উদ্যোগও করিল না।

এমন সময়ে একটী অনবদ্যসুন্দরী বিধবা রমণী আসিয়া তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল—"শুনেছ বৌদি! এখনি ত যেতে হয়!"

কিশোরী সুরমা তাহার দিকে হতাশা-মিশ্রিত চক্ষুর ব্যাকুল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল—'কি হ'বে ঠাকুরঝি!"

প্রভাবতী ধীরস্বরে বলিল—"কিছু ভয় নেই বৌদি, তুমি গিয়েই হয়ত দেখ্‌বে ভাল আছেন!"

সুরমার চক্ষে জল আসিয়াছিল—সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল কেন ঠাকুরঝি! আজ মায়ের এই অসুখ, সাত দিন তাঁর পত্র পাইনে, কে যেন আমায় বল্‌ছে—তোর চারি-দিকেই বিপদ্—চারিদিকেই অন্ধকার!"

প্রভাবতী হাঁসিয়া বলিল,—"তোমার একটুতেই চারিদিক্ অন্ধকারময় হয়। বড়দার এই কয় দিন পত্র না দেওয়া অন্যায় সত্য, কিন্তু তা' বলে

আমি ত তার মধ্যে ভাবনার কিছু খুঁজে পাই নে! পুরুষের নানান্ কাজ!”

সুরমা কথাটা ভাল বুঝিতে পারিল না। স্বামীর অনেক কাজ হ'তে পারে! কিন্তু তাহাকে যে দৈনিক একখানা করিয়া সহস্র কথায় ভরা পত্র লেখাও যে তাঁর মস্ত কাজ। সেই অসম্বদ্ধ প্রলাপময় নানাছটায় নানা ভঙ্গীতে পত্র লেখাও যে তাঁর সব কাজের আগে। আজ সপ্তাহ সেই পত্র নাই, একি হতে পারে! যে অফুরন্ত প্রেমের সমুদ্রে সে ভাসমান, সেই সমুদ্র কি হঠাৎ কোন মায়াজালে কোথাও অদৃশ্য হইতে পারে? তোমরা বলিয়া দাও গো! একি সম্ভব! যে স্বামীর অনন্ত বিস্তৃত উদার একনিষ্ঠ হৃদয়টা তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া থাকে, সেই হৃদয়টা কি এই কয় দিনে এমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? সুরমা ভাবিয়া কিছু কূল পাইল না। শূন্যদৃষ্টে প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া বলিল—“সব বুঝি ঠাকুরঝি! কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ও কথাটা মোটেই খাটে না! আজ যার কাছে যাচ্ছি, জানি না সেখানে গিয়ে কি দেখ্‌ব! কিন্তু এবাড়ী ক্ষণেকের জন্যও ছাড়্‌তে আমার মনটা এমন খারাপ হচ্ছে কেন ঠাকুরঝি!”

প্রভাবতী সুরমার চিবুকে হাত দিয়া বলিল—“আত্মীয় জনের অসুখের কথা শুন্‌লে, ওরকম হয়! তুমি কিছু ভেব না।”

“ভাব্‌ব না ঠাকুরঝি! আমার মাথায় শিরায় শিরায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে। চারিদিক হতে যেন কে এসে আমাকে কোন পাতাল গহ্বরে বদ্ধ করে রাখ্‌তে চাচ্ছে! দেখ ঠাকুরঝি! তিনি যদি বাড়ী আসেন—তবে আমার কথাটা তাঁকে ভাল করে বল্‌তে ভুল না।” সুরমা প্রভাবতীর বক্ষের মধ্যে তপ্তাশ্রুভরা মুখখানা রাখিয়া কাঁদিয়া

ফেলিল। প্রভাবতী নিজের মুখ খানা উঁচু করিয়া আকাশের একটা বড় তারার দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র। কিছু বলিল না।

(৪)

সুশীলের বাড়ী যাওয়ার পরক্ষণেই মেসে একটী মস্ত আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল।

সুরেশ আসিয়া দলের মধ্যে চেঁচাইয়া বলিল—"ভাল হ'ল না—কিন্তু—"

নবকান্ত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"রেখে দাও তোমার কথা, বেচারা বাড়ী গিয়ে সেই টুকটুকে মুখখানা দেখে বাঁচুক, এক হিসাবে আমরা ভাল করেছি ব'লতে হবে!"

উপেন্দ্র বিষণ্নস্বরে বলিল—"তোমরা ত এক রকম ভাবছ, সাত দিনের সাতখানা পত্র না হয় আমরা লুকিয়ে রাখলুম, কিন্তু তার বাপ যে পত্র লিখেছে—'বৌমার সাত দিন অসুখ,' এ কথাটা কি ভেবে দেখেছ! আজকেও সুশীলের স্ত্রীর যে পত্র এসেছে, তাতেও ত অসুখের কোন সংবাদ নেই।" তখন দলের মধ্যে একটা ভাবনার বিষয় আসিয়া পড়িল। সকলেই চুপ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

রমেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল—"সুশীলের স্ত্রীর চিঠিতে পত্র না লেখার জন্য অনুযোগ আছে। সুশীলও কি বাস্তবিক স্ত্রীকে এ কয় দিন পত্র লেখে নাই?"

সুরেশ বলিল—"লিখেছে বই কি! কিন্তু আমরা না হয় তার স্ত্রীর পত্র লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখানেও কি কেউ সুশীলের পত্রও লুকিয়ে রেখেছে?"

উপেন্দ্র চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল—"যাহা হউক, বেচারা বাড়ী গিয়ে সব বুঝতে পারবে। কিন্তু তার স্ত্রীর পত্র তার হস্তগত না হওয়ার সঙ্গে তাহার বাপের পত্রটার বেশ মিল আছে। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।" দলের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গটা যে এমনি ক'রে বিষাদের দিকে অগ্রসর হবে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে নাই। সকলেই ভাবিয়াছিল—সুশীলকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া অন্ততঃ কিছু দিনের জন তাহার বিরহ বেদনা ভুলাইয়া দিবে, কিন্তু ইহার ভিতরও যে কোন গণ্ড-গোল থাকিতে পারে—তাহা কেহই তত বুঝে নাই।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মেসের সকলেই যে যার ঘরে যাইয়া শুইয়াছে। কাহারও ঘরে বা তখন আলোক জ্বলিতেছিল। নবকান্ত বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছিল।

এমন সময়ে কে আসিয়া তাহার দরজা ঠেলিল। নবকান্ত তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া আগন্তুককে লইয়া খাটে বসাইল। ক্ষণপরেই আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নবকান্ত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—"সমস্ত ঠিক?"

"হ্যাঁ ছোটবাবু! সমস্ত ঠিক, সুশীলের শাশুড়ীকে সরান হয়েছে।"

নবকান্ত একটু ভাবিয়া বলিল—"যে জায়গায় তাহাকে রাখা হ'য়েছে কেউ টের পায় নি?"

"না।"

"সুরমা সেখানে এসেছিল? হরিহর এসেছিল? তারপর—"

"হ্যাঁ ছোটবাবু! সমস্ত ঠিক!" বলিয়াই আগন্তুক নবকান্তের কাণে কাণে কতগুলি কথা বলিল।

নবকান্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তুমি এখন যেতে

পার।" পরক্ষণেই সেই আগন্তুক গৃহ হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নবকান্ত তখন সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইল। দর্পণের কাছে আসিয়া একবার নিজের পোযাকটা দেখিয়া লইল। পরক্ষণেই সে হাসিয়া আপন মনেই বলিল—"বেশ হ'য়েছে—এতেই হবে।" ক্ষণপরেই বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। 'থাক সুরমা! আপনার সুখসৌভাগ্যের স্মৃতি নিয়ে আমাকে তখন উপেক্ষা ক'রেছিলে! প্রাণভরা তৃষ্ণা নিয়ে—আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে তোমার চরণে লুঠাতে গিয়েছিলাম—ফিরেও চাইলে না। এমন ক'রে আমার জীবনকে বিফল ক'রেছ ব'লেই ত আমি আজ দানব! এমন ক'রে সতীত্বের গর্ব্ব নিয়ে আমার প্রাণের ভিতর আগুন জ্বালিয়াছ বলিয়াই ত আজ আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ! উপেক্ষা ক'রেছ—আমি কিন্তু ভুলি নি। তোমাকে চাই—তোমার ওই অনিন্দ্য-সুন্দর দেহলতাকে বুকে না করতে পারলে আমার জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে। হয় তোমাকে চাই, নয় তোমার সর্ব্বনাশ! উত্থান, না হয় পতন! আজ তুমি আমার আয়ত্তে!" নবকান্ত উত্তেজিত হইয়া রক্তচক্ষে বাহির হইয়া গেল।

(৫)

ইচ্ছামতীর প্রতিকূল তরঙ্গহিল্লোলের বাধা অতিক্রম করিয়া সুশীলের নৌকা তাহাদের সদর ঘাটে আসিয়া সংলগ্ন হইল। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সে দিন চন্দ্রদেবের হাঁসিভরা মুখখানা তখনও আকাশের গায়ে উদিত হয় নাই, তখন পৃথিবীর গাত্র হইতে সবুজ রংয়ের ওড়নাখানা অন্তর্হিত হয় নাই, আকাশের নক্ষত্রগুলার হাঁসি মুখের প্রভাবটা তখনও

খর্ব্ব হইয়া যায় নাই,—মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ তখন কেবলমাত্র চুপিসাড়ে হৃদয়রাজ্যের অভ্যন্তরে ঘা দিয়া একটা কোমল রাগিণীর সুর তুলিয়া দিতেছিল।

সুশীলের হৃদয় এই জড়প্রকৃতির শোভায় তখন মোটেই আকৃষ্ট হইতেছিল না। সুরমার চিন্তাতেই সে অস্থির হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার জীবনের রক্তিম ঊষারাণীর এই আকস্মিক ম্লানতার সংবাদ তাহার সমস্ত সুখৈশ্বর্য্যের উপর যেন বজ্রাঘাতের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

ঐ বাড়ী দেখা যায়! ঐ গৃহের একটী অংশে সুরমা রোগশয্যায় শুইয়া তাহার ভাবনা ভাবিতেছে, এই গৃহের একটী অংশে তাহার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত ছবি আজ ম্লান হইতে বসিয়াছে। সুশীল ছুটিয়া চলিল।

সম্মুখে গৃহোদ্যান, বাড়ীর মেয়েরা এই উদ্যানেই দিনে, সন্ধ্যায় কখন বা অল্প রাত্রি পর্য্যন্ত নির্ভয়ে বিচরণ করে। সম্মুখে ফটক, ফটকের পার্শ্বেই নানা কৃত্রিম উপায়ে সজ্জিত বিহারভূমি। সুশীল কি ভাবিয়া সেই উদ্যানের দিকে চলিল। কিন্তু কেহ তাহার অভ্যর্থনা জন্য ত ছুটিয়া আসিল না, কেহ তাহাকে আগাইয়া লইতে ত আসিল না! 'একি চারিদিক নিস্তব্ধ কেন! বাড়ীতে কি জনমানব নাই! তবে কি সুরমা—!' সুশীল আর ভাবিতে পারিল না—উদ্যানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বাহির হইতে উদ্যানের দ্বার খোলা ছিল, সেদিকে সে দৃষ্টিপাতও করিল না, সম্মুখে অনতি-দূরে একটী বেদী, বেদীর উপরে কে যেন তখন বসিয়াছিল। "একটী স্ত্রীলোক—না? শুভ্রবসনে শুভ্রমূর্ত্তিতে বুকে হাত দিয়া ও কি ভাবিতেছে?"

পরক্ষণেই একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। একটী সুবেশ পুরুষ তড়িতের প্রকাশের মতই সেই স্ত্রীলোকের পার্শ্ব হইতে উঠিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। সুশীল তাহাকে স্পষ্টই দেখিতে পাইল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। কিন্তু সে তখন হতবুদ্ধি হইয়া—হতচৈতন্য হইয়া স্ত্রীলোকের সম্মুখে অগ্রসর হইল, এবং সরোষে ডাকিল—"প্রভাবতি!"

প্রভাবতী ভয়ানক চমকিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল—"দাদা না কি?" কখন এলে দাদা?"

সুশীলের তখন চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতেছিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"কে তোর পার্শ্বে ছিল রাক্ষসি!"

প্রভাবতী দাদার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, প্রাণে তাহার কেমন যেন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, সে তখন উদ্‌ভ্রান্ত-প্রাণে বলিল—"একি কথা দাদা! আমার পার্শ্বেত কেউ ছিল না?"

"ছিল না পাপিষ্ঠা! একদিন তোর সমস্ত কথাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আজ চোখের উপর যা দেখ্‌লাম, তাও কি মিথ্যা—পাপীয়সি!"

প্রভাবতী তখন ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতেছিল—এত বড় অপবাদ তাহার সতীত্ব-গর্ব্বিত-দেহে যেন সহ্য হইতেছিল না—সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"কি দেখেছ দাদা?"

"কি দেখেছি? দেখেছি তোর পাশে একটা পুরুষ বসে ছিল, দেখেছি কলঙ্কের কালিমারাশি যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে তোর রূপে তার পাশে বসেছিল! এই দেখাবার জন্য কি আমাকে পত্র লিখে আনান হয়েছে?" সুশীলের তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না।

আর প্রভাবতী! এই বজ্রশনিসম্পাতে—এই অরুন্তুদ অপূর্ব্ব প্রহেলিকার আবির্ভাবে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কেহ দেখিল না, আর কেহ শুশ্রূষাও তার করিল না।

এদিকে উদ্যানের ভিতরে আর সুশীলকে দেখা গেল না। উদ্যানের সম্মুখে সেই বৃহৎ বাড়ীটার ভিতর হইতে কেবল একটা অব্যক্ত কাতরোক্তি শুনা যাইতেছিল—"সুরমা! সুরমা!"

বাড়ীর ক্ষুদ্র পরিজনেরা আকস্মিক এই অভূতপূর্ব্ব ভৌতিক ব্যাপারের মত অবিশ্বাসী বাণীগুলা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল—কেহ সাড়া দিল না।

(৬)

"আগুন! আগুন!" নৌকা হইতে হরিহর বাবু চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আগুন! আগুন!!" সুরমা পিতার পাশে বসিয়া নৌকার আঘাতে নদীর বক্ষস্থলের আলোড়নটা লক্ষ্য করিতেছিল, কখনও বা নদীবক্ষের সেই বীচিমালার উর্দ্ধ উৎক্ষিপ্ত লবণাক্ত সলিলরাশি কেমন জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নিকণার মালা উপহার দিতেছিল, তাহাও লক্ষ্য করিতেছিল। শ্বশুরের চিৎকারে সে আহত হইয়া যেন চাহিয়া দেখিল—নদীর উপরে একটু দূরে একখানা ঘর পুড়িতেছে। সে অকস্মাৎ অতিভীত হইয়া বলিল—"বাবা! বাবা! সর্ব্বনাশ হল বুঝি!"

হরিহর সোৎকণ্ঠে বলিলেন—"কি হবে মা! তুমি একা একটু থাকতে পারবে? আমি দেখে আসি!"

"না বাবা! আমিও যাব, মা! মা!—কি হবে বাবা!" অশ্রুভরে সুরমার চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর জোর করিয়া সুরমাকে নৌকার মধ্যে বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"ভয় কর না মা! তুমি ওখানে কোথায় যাবে? আমি এখনি আসি-তেছি!" হরিহর সেই আগুনের দিকে ছুটিলেন। তখন সুরমার মাতার ঘরখানি প্রবল আগুনে জলিতেছিল। চারিদিকে একটা হাহাকার ধ্বনি যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধার মৃত্যুকাহিনীটাও সেই সঙ্গে অস্পষ্ট ভাবে গুমরিয়া উঠিতেছিল।

এদিকে কিন্তু একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সাত আট জন পুরুষ কোথা হইতে দ্রুত আসিয়া সুরমার নৌকার উপর চড়িয়া বসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে দাঁড়ি মাঝিরা নির্ব্বাক হইয়া আপন আপন স্থান ছাড়িয়া দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকাখানা গভীর জলে যাইয়া পৌছিল। সুরমা এই ব্যাপারে প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কি যে ঘটিতেছে, কি যে হঠাৎ মায়াবাজীর মত একটা খেলা খেলিয়া গেল, সেও যে সত্যকার জাগ্রত অবস্থার মধ্যে আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিয়া সে দীপ্ত প্রাণে সোজা হইয়া বসিল। কি একটা ভাবিয়া নিজের অঙ্গরাখার মধ্য হইতে একখানি দীপ্ত ছুরিকা বাহির করিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়াই তীব্রকণ্ঠে ডাকিল—"রামচরণ!"

রামচরণ বাড়ীর চাকর। তাহার দেহে অসীম শক্তি, হৃদয়েও অতুল সাহস! হরিহর পথঘাটের বিপদাপদের কথা স্মরণ করিয়াই তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। সে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"কি করব দিদিমণি! আমাকে হঠাৎ বাঁধিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।"

সুরমা তখন ধীরস্বরে বলিল—"শোন রামচরণ! যারা এই নূতন বিপদ সৃষ্টি ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হ'য়েছে, তাদের দল—

যে আমার কেশস্পর্শও করতে আসবে, হয় তাহার মৃত্যু—না হয় আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।”

একটা পুরুষ সুরমাকে ধরিবার জন্য সম্মুখে আসিতেছিল, সে এই কথা শুনিয়া সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইল না। তখন অপর পারের অরণ্যশ্রেণী নিকটতর হইতেছিল। ঘনবনের মধ্য হইতে হঠাৎ একটা বাঁশি বাজিয়া উঠিল। সুরমার প্রাণটাও সেই স্বরে শিহরিয়া উঠিল। হাতের ছুরিকাখানা আরও সোজা হইয়া উঠিল।

(৭)

অগ্নিদেবের প্রবল লেলিহান জিহ্বা যখন সুরমার মাতৃদেবীর সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন লোপ করিয়া দিয়া আপনিই উপশান্ত হইল, তখন হরিহর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এতক্ষণ তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া অগ্নিদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র সেই বরুণাস্ত্রের প্রভাব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পারিয়া উঠিবে কেন?

সুরমার মাতার মৃত্যু সম্বন্ধে কাহারও আর সন্দেহ ছিল না—হরিহরেরও না। তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া হঠাৎ সুরমার কথা ভাবিয়া নদীতীরে যেখানে তাঁহার নৌকা ছিল, সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। সব শূন্য! কোথায় বা নৌকা! কোথায় বা তাহার চিহ্ন! হরিহর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিলেন। নদীর তীর ধরিয়া অগ্রপশ্চাৎ কতদূর গেলেন, কোথাও নৌকা নাই। মানুষের মাথার সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে সে যতটা না বিমূঢ় সংজ্ঞাশূন্য হয়, হরিহর তদপেক্ষা হতচেতন হইয়া শেষে নদীতীরে নিশ্চল হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার নিকট সমস্তই প্রহেলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এই সমস্ত সত্য ছিল, আর হঠাৎ কোন্ মায়াবলে সে কোথায় লোপ পাইয়া গেল। এমনি করিয়া যে বিপদের উপর বিপদ এক মুহূর্ত্তে ঘটিয়া যাইবে, তাহা কে ভাবিতে পারে? হরিহর অনেকক্ষণ শোকার্ত্তবৎ অবিষ্টবৎ বসিয়া থাকিয়া শেষে থানায় যাইয়া সমস্ত ডাইরী করিয়া আসিলেন। অতিরিক্ত টাকার লোভ দেখাইয়া চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন, স্বয়ং সেখান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া ভালরকম তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন উষাদেবীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, বড় বড় গাছের আগায় রক্তিম রৌদ্রের কিরণ ফুটিয়া উঠিয়া নিশারাণীর মুখখানা পাণ্ডুবর্ণ করিয়া দিয়াছিল। টপ্ টপ্ করিয়া শিশিরবিন্দুগুলি ফুলফলপাতার উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া নিশারাণীর বিরহাতুর প্রাণের কান্নারাশি উপহার দিতেছিল। ঘুমভাঙ্গায় জাগ্রত পাখীগুলিও যেন কোলাহল করিয়া সেই কথাটাই বড় করিয়া বলিতেছিল।

হরিহরের প্রাণেও কান্নারাশি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তাহার চক্ষুকর্ণের ভিতর দিয়াও বিশ্বপ্রকৃতির কান্নাস্রোতও যেন বাজিতেছিল। তিনি চারিদিকেই বিষাদময়—ব্যথাময় দেখিতেছিলেন। যতই তিনি বাড়ীর নিকটে আসিতেছিলেন, ততই যেন কে তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া গতি বন্ধ করিয়া দিতেছিল। অতি কষ্টে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া তিনি বারাণ্ডার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন, আর উঠিতে পারিলেন না।

বাড়ীর চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা, চারিদিকেই যেন একটা বিষাদ-

বেদনার ছবি আঁকা ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ বারাণ্ডার দরজা খুলিয়া গেল—বিবর্ণা প্রভাবতী আলুথালুভাবে বাহিরে আসিয়া ডাকিল—"কে বাবা! বল বল, তুমিও বিশ্বাস ক'রেছ?" প্রভাবতীর চক্ষুর্দ্বয় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

বিপদের উপর বিপদ্, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, হরিহর অবাক্ হইয়া কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

কন্যা আবার বলিল—"কি বল্লে না? তবে তুমিও বিশ্বাস ক'রেছ? তোমার মুখের একটী কথার অপেক্ষায় আমি জীবনটা এখনও ধ'রে রেখেছি! বল—বিশ্বাস ক'রেছ?"

হরিহর দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রভাবতীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"এখন আর কিছুই অবিশ্বাস্য নয় প্রভাবতি! ঘরের আগুনে সুরমার মাতার পুড়ে মরা বিশ্বাস ক'রেছি! চোখের সামনে সুরমার অন্তর্ধানও বিশ্বাস ক'রেছি! আর আমার সাম্‌নে যে তুই দাঁড়িয়ে আছিস্, এটাও মরা ব'লে বিশ্বাস করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই! তুই মরেছিস্ ত?" হরিহরের অঙ্গ ঘন ঘন কাঁপিতেছিল।

প্রভাবতীর সেই দীর্ণ বড় বড় চক্ষু দুইটা হঠাৎ স্থির হইয়া গেল! হঠাৎ সেই শুষ্ক নেত্রপ্রান্ত হইতে যেন পুঞ্জিত অশ্রুস্রোত উপ্‌চিয়া উঠিল। সে তখন বাষ্পভরে বলিল—"বৌদির মা মরেছে? বৌদিকেও হারিয়ে এসেছ? আর বাবা! আমাকেও হারিয়েছ। আমি এ প্রাণ আর রাখব না।"

হরিহর ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"আমার কাছে আজ যেন জগৎটা বড় নূতন রকমের হ'য়েছে যে প্রভাবতি! তুইও, যে এখনি মরতে পারিস্, আর সুশীলও যে এখনি পৃথিবীর কোণে জন্মের মত লুকোতে

পারে, তাহা আর আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না। কি হ'য়েছে সমস্ত বল।"

প্রভাবতী পিতার কাতর বাক্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, দাদার কথা সে অত করিয়া ভাবে নাই, আপনার দিক্‌টাই সে ভাবিয়া নিজের প্রাণটাকে জগতের কোল হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল একবার পিতার একটী কথা শুনিবার অপেক্ষা করিতেছিল। সে তখন ধীরে ধীরে সে দিন রাত্রের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। পিতার পা স্পর্শ করিয়া আপনার সত্য কথাগুলি কিছুই লুকাইল না।

তখন হরিহর থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—"তোর কথা বিশ্বাস ক'রেছি প্রভাবতি! কিন্তু সুশীলকে বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না।"

প্রভাবতী বাষ্পভরে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"কি হবে বাবা!"

"হবে আর কি? এক একখানা ক'রে আমার পাঁজরের হাড় খ'সে যেতে ব'সেছে, তুই ত আর একা, তা' জোড়া দিয়ে দিতে পার্‌বি নে?"

প্রভাবতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া বলিল—"আমি পার্‌ব, আশীর্ব্বাদ কর বাবা আমি পার্‌ব।" সে তখন দুই হাতে পিতার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

(৮)

দেওয়ান রামসদয় বাবু আসিয়া ডাকিলেন—"দাদা মহাশয়! আছেন না কি?" রামসদয় দেওয়ান হইলেও বাড়ীরই একজন, হরিহর তাহাকে

ভাইয়ের চক্ষেই দেখিতেন, বাড়ীর ছেলেরাও তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকিত। দ্বিতলের একটা প্রকোষ্ঠ খুলিয়া প্রভাবতী বাহিরে আসিয়া বলিল—"বাবাকে আর এখন ডাকবেন না কাকামহাশয়! তাঁর মাথার ঠিক নেই, যা বল্‌বার আমাকে বলুন, না হয় আপনিই সমস্ত ঠিক করুন।"

"বড় দুঃসংবাদ মা! পিরোজপুরের বড় জমীদারীটা কালীকান্ত বাবু বাকী খাজনার দায়ে নিলাম ক'রে নিয়েছেন! আমরা আগে কিছুই টের পাই নাই।" রামসদয় বাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রভাবতী হাসিয়া বলিল—"জমীদারীর কথা এখন থাক্‌, রাখতে পারুন ভাল, নচেৎ ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই! একটা কাজ কর্‌তে হবে কাকা!"

"কি কাজ মা!" দেওয়ান ব্যাকুল চক্ষে প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তখন দেওয়ানের সঙ্গে প্রভাবতীর অনেক পরামর্শ হইল। ক্ষণেক পরে দেওয়ান উঠিয়া গিয়া নদীর দিকে দৌড়াইলেন।

প্রভাবতী ডাকিল—"হরিমতি!"

হরিমতী শুষ্কমুখে আসিয়া বলিল—"কি বলছ দিদিঠাক্‌রুণ!"

প্রভাবতী হাসিয়া বলিল—"কিচ্ছু নয় হরিমতি! তোকে একটা কাজ কর্‌তে হবে, আমার কলঙ্কের কথা শুনেছিস্ ত! তখন তোকে বলাই ভাল—।" প্রভাবতী লজ্জানম্রমুখে মাটীর পানে চাহিয়া রহিল।

হরিমতীর হৃদয় হইতে একটা মহাভয় দূর হইয়া গেল। সে তখন

হাঁসিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—"কি বল্‌ব দিদিঠাক্‌রুণ! তোমার মত সোণার প্রতিমার দশা দেখে আমি কত দিন কেঁদেছি!" হরিমতী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

প্রভাবতীর চক্ষু দুইটী জ্বলিতেছিল, সে সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আর সহ্য কর্‌তে পারি না হরিমতি! এ রূপ, এ বয়স কি বৃথাই যাইবে?"

হরিমতী জিহ্বা বাহির করিয়া, তার উপর জোরে দাঁত চাপিয়া বলিল—"তুমি যদি বল ত আমি সব ঠিক ক'রে দিই।"

প্রভাবতী হরিমতীর কাছে আসিয়া অনেক কথা কহিল, অনেক সুখদুঃখের কথা, অনেক সাধ আহ্লাদের কথা বলিয়া। হরিমতীর মনটা ভিজাইয়া দিয়া একটু চোখের জল বাহির করিয়া ফেলিল।

হরিমতী তখন একে একে সব কথা খুলিয়া বলিল, ও বাড়ীর বড় বাবুর কথা, তাহার চেষ্টার কথা, তাহার প্রেমময় হৃদয়ের কথা বলিয়া সে দিন রাত্রের ব্যাপারটাও খুলিয়া বলিল। সে দিন রাত্রে যে রমাকান্ত প্রভাবতীর সন্ধানে আসিয়া সুশীলের অকস্মাৎ আবির্ভাবে ভীত হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিল। প্রভাবতীর ভাবী সুখসৌভাগ্যেরও ইঙ্গিত করিয়া এক গাল হাঁসিয়া উঠিল।

তখন হরিমতী ও প্রভাবতীর অনেক কথা হইল। প্রভাবতী গৃহ হইতে এক মুঠা টাকা আনিয়া হরিমতীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"আজ তোরও এই সামান্য পুরস্কার!" হরিমতী নত হইয়া প্রণাম করিয়া আনন্দে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাবতী সেখানে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল, শেষে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

(৯)

একটি সুন্দর উদ্যান, উদ্যানের মধ্যস্থলে একখানি সুন্দর গৃহ! সম্মুখে ইচ্ছামতির অগণিত তরঙ্গহিল্লোল, আর দূরে নদীবক্ষে ক্বচিৎ কোন মাঝির—

"আমি গো তোমার বন্ধু আমি গো তোমার!
তোমার লাগি কলঙ্কী নাম জগতে রাধার গো!"

এই ভাবের গান আকাশ বাতাসে নাচিয়া নাচিয়া সেই গৃহের অধিবাসীকে উপহার দেয়।

সেদিন এই গৃহেরই একটী প্রকোষ্ঠে বন্দিনী সুরমা ভাবিতেছিল। তাহার আর সে প্রভা-তরল-জ্যোতি রূপ নাই, সে দেহের ঢলঢল লাবণ্য ও নাই, মুখ শুষ্ক, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, মস্তকের কেশ রুক্ষ ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সুখস্বর্গের উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া আজ সে ধূলি ধূসরিত, মলিন, দীনাদপিদীন ছিন্নলতার মত সেদিন ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছিল।

এমন সময়ে সেখানে নবকান্ত উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ মুখ শুষ্ক, চিন্তাভার পীড়িত। সুরমার দিকে রোষকটাক্ষে চাহিয়া নবকান্ত বলিল—"এখনও ভেবে দেখ সুরমা! সংসার তোমার—নিরুদ্ধ রুদ্ধ, সমাজ হইতে তুমি পতিত, সুখসৌভাগ্যের, আশা, যাদের কাছে তুমি করেছিলে—তাদের নিকট আর পাবে না। আর আমি! কিশোর-বয়সের কমনীয় মাধুর্য্য নিয়ে যখন তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে দীপ্তিমতী হয়ে উঠেছিলে, তখন থেকে তোমার পায়ে আমি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে ছিলেম, তুমি ছাড়া আমার আর কিছু নাই! আমার সমস্তই তোমার! বল বল আমার হৃদয় রাজ্যের অধিশ্বরী হবে?"

সুরমা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া সেই কঠোর কথা কয়টীর শ্রবণপথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। চীৎকার করিয়া দীপ্তচক্ষে বলিল—"কেন তুমি আমার নিকট বারবার এসে অত্যাচার করতে উদ্যত হও? জান না কি তুমি সতীর নিকট স্বামীর স্মৃতি ছাড়া সংসারের সমস্তই তুচ্ছ! আমি কিছু চাই না, সংসারের বৃথা সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হ'য়ে আমি আমার সারধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে মোটেই প্রস্তুত নহি। তুমি আমার প্রাণ নিতে পার—দেহ পাবে না।" ঘৃণায় সুরমা নবকান্তের দিকে আর চাহিল না।

নবকান্ত তখন উন্মত্তবৎ সুরমার পায়ের নিকট পড়িয়া বলিল—"রক্ষা কর সুরমা! আমি যে পথে চ'লেছি, সেখান থেকে আর ফিরবার উপায় নেই, তোমাকে না পেলে আমার সর্ব্বনাশ হবে, আমি মরিব, আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, আমায় বাঁচানও কি তোমার ধর্ম্ম নহে?"

সুরমা হাঁসিয়া বলিল—"ছা'র তোমায় মৃত্যু নবকান্ত! সংসারটা যদি আজ নষ্ট হ'য়ে যায়—জগৎটা যদি আজ লোপ পেয়ে যায়, তথাপি আমার সারধর্ম্ম সকলের উপরে থাক্‌বে। শূন্যের মাঝে কক্ষাবিচ্যুত উল্কার ন্যায় ঘুর্‌ব, সেও স্বীকার, তথাপি তোর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অতি ঘৃণ্য, অতি অসার বিবেচনা করি।"

নবকান্তের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল। সে তখন দৌড়িয়া গিয়া বলিল—"সার বা অসার এইবার বুঝা যাবে!"

সুরমা দুই পা পিছাইয়া কাপড়ের ভিতর হইতে সেই শাণিত ছুরিকা খানা বাহির করিয়া অপরহাতে নবকান্তের হাত ধরিয়া বলিল—"এইবার নবকান্ত!" ছুরিখানা তখন নবকান্তের

রক্তপানাশায় লক্ লক্ করিতেছিল। সুরমার চামুণ্ডামূর্ত্তি তখন কাঁপিতেছিল।

নবকান্ত তখন মূর্চ্ছিত হইয়া সুরমার পদপ্রান্তে পতিত হইল। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সুরমা ছুরিখানা আবার পূর্ব্বের মত অঙ্গরাখার মধ্যে সাবধানে রাখিয়া—নবকান্তের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল—তখন নবকান্ত দেখিল—তাহার শিয়রে একখানা দেবীমূর্ত্তি—একখানা মাতৃমূর্ত্তির মত উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত নারী মূর্ত্তি তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

সুরমা তখন স্নেহ করুণ স্বরে বলিল—"বেশী লেগেছে কি ভাই?" এই স্নেহের আহ্বানে নবকান্তের হৃদয়ে একটা নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহার কামনাকলুষ হৃদয়রাজ্যের—ময়লাগুলি সমস্ত পরিষ্কৃত হইয়া গেল। দেবী মূর্ত্তির নিকট দানবীমূর্ত্তি বশীভূত ও পরাজিত হইয়া আপনার সত্ত্বা বিসর্জ্জন দিল। নবকান্তের হৃদয়ে—একটা মস্ত ওলট্—পালট্ হইয়া গেল। কামনার মাঝে কামের স্ফূর্ত্তি, বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই কাম কি সত্ত্বের কাছে—দেবতার কাছে বিকাশ লাভ করিতে পারে?

নবকান্তের চক্ষুতে হঠাৎ অশ্রুবিন্দুগুলি কোথা হইতে আসিয়া উথলিয়া উঠিল। সে তখন উঠিয়া বসিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

সুরমা আবার কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"ছিঃ ভাই, দুঃখ কর না, মানুষের অনেক ভ্রম হয়ে থাকে, আমি সব ভুলে গেছি, আজ থেকে তুমি আমার দাদা!"

নবকান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া আসিয়া সুরমার পদধারণ করিয়া বলিল—"না না, ওতে হবে না, আজ থেকে তুমি আমার মা!"

সুরমা বাষ্পভরে গদগদ স্বরে বলিল—"তবে তাই হোক্!"

(১০)

সেদিন অপরাহ্নে উন্মত্তের ন্যায় সুশীল কলিকাতার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। জবাফুলের ন্যায় তাহার চোখ্ দুইটা রাঙা, মুখ বিবর্ণ, শুষ্ক, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, ভূষণাদি তাহার সমস্ত বিপর্য্যস্ত ও ছিন্ন। ঝড়ের মত সে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরের চাবি খুলিল। মেসের অপরাপর যুবকেরা হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিয়া—সুশীলের পাশে দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু তাহার সেই ভ্রূকুটী কুটীল প্রদীপ্ত চোখের তাড়া খাইয়া আপন আপন ঘরে যাইয়া বসিল।

ঘরে ঢুকিয়া সুশীল গৃহের সমস্ত স্মৃতি চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে লাগিল, সুরমার সুন্দর ছবি ভাঙ্গিল, একতাড়া পত্র বাক্স হইতে বাহির করিয়া পোড়াইল, বিবাহ সময়ে—উপহার যত পাইয়াছিল, কতক পোড়াইল—কতক বা জানালা দিয়া গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, সমস্ত নিঃশেষ করিয়া বিছানার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। বালিসের উপর মুখ রাখিয়া সে দিন সে কত কান্নাই যে কাঁদিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভগিনী প্রভাবতীর চরিত্রের উপর অযথা কলঙ্কারোপ করিয়া সে জগৎটা পর্য্যন্ত অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছিল, সে দিন রাত্রে যখন সে সুরমাকে অন্বেষণ করিয়া বাড়ীময়—খুঁজিয়া পায় নাই, তখন সুরমার চরিত্রের উপর একটা ভয়ানক কলঙ্করাশি চাপাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করে নাই, এমনি তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সামান্য এক ভ্রমের বশে সে অন্তরের দাবদাহে কেবল পুড়িল। শান্তির আশায় ছুটিয়া গিয়া সে যে অমৃতের সন্ধানে বাড়ী গিয়াছিল, অমৃত

ত সে খুঁজিয়া পাইল না, পরন্তু তাগার পরিবর্ত্তে তীব্র হলাহল পান করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে তাহার আজ এই অবস্থা।

হায়—স্মৃতি-চিহ্ন ধ্বংশ করিলে কি গনের জঞ্জাল দূর হয়! মনের পরদায় পরদায় যে তাহার স্বর্ণোজ্জ্বল ছবিখানা গাঁথা রয়েছে। মনটাকে সে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই, তবে বাহিরের আবরণ চিহ্নগুলাকে দূর করিয়া সে বেশী কি করিল? কান্না কেন? সব শেষ করিতে ত সে বসিয়াছে, তবে দুঃখ কেন?

ক্ষণৈকপরে—ধীরে ধীরে সুরেশ অসিয়া তাহার বিছনায় বসিল। সুরেশ তাহার বাল্য বন্ধু। সে ধীরে ধীরে—সুশীলের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সুশীল আকস্মিক এই করুণ হৃদয়ের উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া জলভরা চক্ষু দুইটা সুরেশের দিকে স্থাপন করিল। সুরেশ কম্পিত কণ্ঠে বলিল —"ছিঃ কান্না কেন ভাই! বাড়ীর কি খারাপ সংবাদ আছে?"

সুশীলের চক্ষুদিয়া হু হু করিয়া জল বাহির হইতেছিল। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া—ক্ষণৈকপরে ফিরিয়া বলিল—"খারাপ সংবাদ! হ্যাঁ সব শেষ করে এসেছি ভাই!"

সুরেশ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কোনরকমে স্থির হইয়া বলিল—"কবে হ'ল?"

সুশীল জলভরা চোখেও হাঁসির দীপ্তি ফুটাইয়া বলিল—"হল কি? কেউ মরে নি, কিন্তু মলেও বোধ হয় এতটা শাস্তি পেতাম না।"

সুরেশ ব্যগ্র হইয়া বলিল—"শাস্তি? তবে কিসের শাস্তি ভাই?"

সুশীল উঠিয়া বসিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল—"সব ভোজবাজী! এত স্নেহ প্রেম সব বৃথা! বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লেম আমার স্বর্ণসিংহাসন

পরের হাতে গিয়ে পড়েছে! সুরমা—! সে একা নয়, আরও অনেকে আমাদের স্নেহ প্রীতি বিসর্জ্জন দিয়ে অনেক দূরে সরে পড়েছে!"

সুরেশ রক্তচক্ষে উঠিয়া বলিল—"মিথ্যা কথা! চোখের সম্মুখেও দেখ্‌লে আমি এ কথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। সেটাকে মায়াজাল বা ইন্দ্রজাল ব'লে উড়িয়ে দিই। কিন্তু তুমি কি পাষণ্ড! সুরমাকে বাড়ীতে দেখেছ?"

সুশীল হাঁসিয়া বলিল—"আমিও তাই আগে মনে কর্‌তাম সুরেশ। কিন্তু বাড়ী গিয়ে দেখলাম—ভগিনী বিশ্বাসঘাতিনী, সুরমা অন্তর্হিত, পিতাও অন্তর্হিত। আমাকে টেলিগ্রাফ করে বাবা বোধ হয় এই দৃশ্যটা দেখাবার জন্য ডেকেছিলেন, কিন্তু তিনি সে দৃশ্য দেখতে পারবেন না ব'লেই বাড়ী থেকে স'রে গেছেন। অসুখ টসুখ সব ছল—বুঝলে?"

সুরেশ ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল, পরে কোথা হইতে কতকগুলা পত্র আনিয়া সুরেশের হাতে দিয়া বলিল—"পড়, টেলিগ্রাফটা নিশ্চয়ই তোমার বাবা করেন নাই! নচেৎ সুরমার পত্রেও অসুখের কথা থাক্‌ত। নিশ্চয় তোমার কোন শত্রুপক্ষের চক্রান্ত।"

সুশীল কম্পিতকণ্ঠে সুরমার সেই লুক্কায়িত পত্রগুলি পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"তোমরা বুঝি লুকিয়ে রেখেছিলে?—কিন্তু তারপর—!"

"তারপর অনুসন্ধান কর্‌তে হবে। তোমার পত্রগুলাও সে কেন পায় নি, তার খোঁজ নিতে হবে; টেলিগ্রাফটা কে ক'রেছিল, তারও খোজ কর্‌তে হবে; তার আগে খোঁজ কর্‌তে হবে—তোমার বাবা ও সুরমা কোথায়? ছিঃ ছিঃ!! তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কি অনর্থই না বাঁধিয়ে এসেছ!"

সুশীল সুরেশের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল—"রক্ষা কর ভাই! আমাকে বাঁচাও তা' না হ'লে আমি মর্‌ব।"

সুরেশ ধীরে ধীরে বলিল—"চুপ করে বসে থাক, কাহাকেও কিছু বল না, আমি একটা টেলিগ্রাফ্ করে আস্‌ছি।" পরক্ষণেই সে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

(১১)

দেওয়ান রামসদয়ের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া সুশীল বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল—"বাড়ীর সব ভাল কাকা?"

তখনও রামসদয় হাঁফাইতেছিলেন, সুশীলের এই ভাবে তিনি আরও কাতর হইয়া বলিলেন—"কি বলিব সুশীল! সুরমাকে চোখের উপরে চুরি করে নিয়ে গেল! তুমি—"

"সুরমাকে চুরি করে নিয়ে গেল?" সুশীলের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার গৃহের চারিদিক ঘুরিয়া আসিল। পরে ধীরে বলিল—তা' হ'লে সব গিয়েছে কাকা!"

দেওয়ান সুশীলকে ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন—"অধীর হস্ নে সুশীল! কাতর হ'লে তার উদ্ধারের দেরী হয়ে যাবে। সে যে আমাদের মুখ পানে চেয়ে কাতরনয়নে কত দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে! সতীলক্ষ্মী মা আমার কি যে যন্ত্রণা অনুভব কর্‌ছে, তাহা আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি!" দেওয়ানের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুশীল দেওয়ানের পা ধরিয়া বলিল—"দেরী কর্‌বেন না, শীঘ্র সব কথা খুলে বলুন।"

"তোমার শাশুড়ীর ভয়ানক অসুখের টেলিগ্রাফ পেয়ে তোমার বাপ

আর বধূমাতা তাঁর শেষ দেখা দেখ্‌তে ছুটে গেলেন! কিন্তু দেখা ত পেলেন না! কি বলিব সুশীল! তখন ভয়ানক আগুন জ্বলছিল! তোমার শাশুড়ীর ঘর পুড়ছিল। তোমার পিতা দিশেহারা হয়ে নৌকা থেকে ছুটে গেলেন। সব শেষ করে এসে মাকে আর দেখতে পেলেন না—নৌকাও না!"

সুশীলের গায়ের উপর দিয়া যেন একটা আগুনের অরুন্তুদ উত্তাপ বহিয়া যাইতেছিল। কে যেন তাহার শরীরে তড়িৎ প্রবেশ করাইয়া প্রাণটাকে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল সে তখন অবশ হইয়া ধীরস্বরে বলিল—"তারপর বাবা ইচ্ছামতীর জলে সব বিসর্জ্জন দিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন! আমাকে বাড়ীতে যাবার জন্য কে টেলিগ্রাফ করেছিল কাকা মহাশয়!"

"তোমাকে? কেউ ত করে নি! কেন, কি জন্য, কে টেলিগ্রাফ করেছিল সুশীল?" দেওয়ান বিস্মিতনয়নে সুশীলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কেউ করে নি। সুরমার ভয়ানক অসুখের সংবাদ দিয়ে বাবা আমায় যেতে লিখ্‌লেন। উঃ কি ষড়যন্ত্র। তবে প্রভাবতি! ভগিনি! তুমিও কি ষড়যন্ত্রের জালে জড়িত হয়ে আমার নিকট হ'তে তিরস্কৃত হয়েছিলে? উঠুন, উঠুন কাকা! এখনি যেতে হবে, প্রভাবতীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, তারপর জীবন পণ করে সুরমাকে উদ্ধার করতে হবে!" সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বারের দিকে ছুটিল।

এমন সময় সুরেশ বাহির হইতে সুশীলকে টানিয়া আনিয়া বিমর্ষচক্ষে বলিল—"একটা খারাপ সংবাদ পাওয়া গেছে!"

সুশীল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল —"কি? কি? সুরমা মরে নি ত— শীঘ্র বল!"

"তোমার শাশুড়ী একখানা পত্র লিখেছেন যে,—"

দেওয়ান ও সুশীল যুগপৎ ভয়ানক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"পত্র লিখেছেন? কই দেখি।" সুশীল সুরেশের হাত থেকে পত্র কাড়িয়া লইয়া পড়িয়া বলিল—"উঃ, কি ষড়যন্ত্র!"

দেওয়ান পত্রখানা টানিয়া লইয়া পাঠ করিলেন,—

"বাবা সুশীল! সুরমার ভয়ানক অসুখের সংবাদ দিয়ে তোমার বাবা একটী অপরিচিত লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই লোকের সঙ্গে একা রাত্রিকালে বাহির হয়ে আজ আমি শ্রীপুরে আবদ্ধ হইয়া আছি। আজ কি করে যে তোমায় সংবাদ দিলুম তা' ভগবানই জানেন তোমরা কেমন আছ কিছুই জানিনা, আমাকে শীঘ্র উদ্ধার করিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা—

রামমণি দেবী।"

দেওয়ান ও সুশীল তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। হরিহর বাবুর নিকট টেলীগ্রাফ করিয়া সেই সংবাদটি জানাইতে সুরেশও বাহির হইয়া পড়িল।

(১২)

নবকান্ত রমাকান্তের কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল—"কাজ অনেক গুছিয়ে এনেছি ভাই! এখন শেষ রক্ষা করতে পারলে হয়।" তখন বাহিরে টুপ টাপ করিয়া দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল, সান্ধ্য প্রকৃতির অঙ্গে উদ্দাম মেঘমণ্ডলীর নর্ত্তন কুর্দ্দন চলিতেছিল, মাঝে মাঝে

সৌদামিনী স্ফুরণও চোখ্ দুইটীর উপর আকস্মিক বিভীষিকা জন্মাইয়া দিতেছিল।

রমাকান্ত চারি'দকে চাহিয়া বড় করিয়াই বলিল—"আমিও কাজ গুছিয়ে এনেছি। এখন সমস্তই আমার হাতে! আগে একটু ভাবনা ছিল এখন আমার সেটা মোটেই নেই। কিন্তু তুমি খুব ধড়িবাজ!"

"ধড়িবাজ না হ'লে চলে? কেমন পরামর্শ! হরিমতীকে হাত করে তুমিত সুশীলের পত্রগুলা লুকালে, আমি সেখান থেকে মেসের ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুরমার পত্র গুলা লুকালেম। শেষে তুমি সুশীলের বাবার নাম দিয়ে তাকে টেলীগ্রাফ করলে, আমিও সুরমার মার অসুখ হয়েছে বলে সুরমার শ্বশুরকে টেলীগ্রাফ করলুম। ফলে প্রভাবতীর চরিত্র ও সুরমার চরিত্রের উপর সুশীলের সন্দেহ হয়, তোমার কাজ গুটিয়ে এল! আমাকে কিন্তু একটু বেশী বেগ পেতে হয়েছিল!"

রমাকান্ত আনন্দে নবকান্তের হাতখানা নাড়া দিয়া বলিল—"বেশ বেশ! বক্তৃতায় আর কাজ নেই! কাল প্রভাবতীর কাছে যাবার কথা আছে! হাঁা—সুরমার মাকে ভাল জায়গায় রেখেছ ত?"

"সে ভয় তোমার নেই! কেউ টের পাবে না। হাঁা একটা কথা শুনলাম—ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নাকি এখানে তদন্ত করতে আসছেন?"

রমাকান্ত পাংশুমুখে বলিল—"সত্য নাকি?"

নবকান্ত বলিল—"হাঁ, তবে ভয়ের কথা কিছু নেই। তোমরা সুশীলদের যে জমীদারীটা নিলেম করে নিয়েছ, হরিহরবাবু দরখাস্ত করে সেই নিলেম রদ্ করতে চেয়েছেন। গ্রামের নাকি সমস্ত ভদ্রলোক দরখাস্ত করে জানিয়েছেন যে, হরিহর বাবুর অজানা অবস্থায় এটা হয়েছে।"

রমাকান্ত ভীত হইয়া বলিল—"ও!"

নবকান্ত হাঁসিয়া বলিল—"সেজন্য কোন চিন্তা কর না! দু'দশ জনকে কিছু দিলেই মিটে যাবে, তবে কাল রাত্রেই প্রভাবতী দর্শনে যাওয়া হচ্ছে কেমন?"

রমাকান্ত কাষ্ঠ হাঁসি হাঁসিয়া বলিল—"নিশ্চয়! বিলম্বে কার্য্য-হানি!"

নবকান্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অন্তরে তাহার আগুন জ্বলিতেছিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহা সে খুজিয়া পাইতেছিল না। সেই পাপের অনুতাপে সে ক্লিষ্ট ব্যথিত হইয়াই সুরমার ব্যথা দূর করিবার আগে চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুরমাকে সঙ্গে করিয়া একদম আনে নাই, তাহার ইচ্ছা সমস্ত দিক দেখিয়া, বিপদের পরিমাণটা বুঝিয়া জঞ্জাল সমস্ত দূর করিয়া সুরমা শান্ত মনেই ঘরে ঢুকিবে। নবকান্ত সেই পথ পরিষ্কার করিতে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর।

(১৩)

শ্রীপুরের সমস্ত গ্রাম তোলাপাড় করিয়াও সুশীল শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে খুঁজিয়া পাইল না, তাহার নিকট তখন শ্বশ্রূর পত্রখানাও যেন প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। তখন অপরাহ্ণের সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়া লজ্জা বিনম্রমুখে দিবারাণীর নিকট বিদায় চাহিতেছিলেন, আকাশের গায় শ্রেণীবদ্ধ পাখীগুলাও কলরব করিয়া সেই কথাও যেন চারিদিকে ঘোষণা করিতেছিল, লজ্জায় দিবারাণীর মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। সুশীল ও দেওয়ান রাম সদয় বাবু একটা বট বৃক্ষের

তলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যার সমাগমে উভয়েই একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এমন সময়ে সেখানে নবকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীল তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিল—"কিহে তুমি এখানে? কত দিন কলিকাতা ছেড়ে এসেছ।"

নবকান্ত উদাসীনের ন্যায় বলিল—"আর ভাই, সংসার নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি। কলিকাতা আর পোষাল না, অল্প দিন হল এসেছি, যাহা হউক, তুমি কি মনে করে? বড় রোগা হয়ে গেছ যে?"

সুশীল শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"সামান্য একটু কাজ ছিল? এখন রাত্রিটা কোথায় কাটান যায় বল দিকি?"

"তার ভাবনা কি? আমার বাড়ী এখান থেকে মাইল দুই দূরে, যখন এসেছে, তখন যেতেই হবে ভাই! ইনি কে?" নবকান্ত পার্শ্ববর্ত্তী দেওয়ানের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সুশীল বলিল—"ইহার আর অন্য কি পরিচয় দিব, ইনি আমার সম্পর্কে কাকা। আচ্ছা কাকা মহাশয়! আপনি তবে আজই বাড়ী গিয়ে অন্য বন্দোবস্ত করুন। আমার জন্য ভাববেন না, আমি আর একবার খুঁজে দেখ্‌ব।"

দেওয়ান সুশীলের কানে কি কতগুলা কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন। সুশীল উঠিয়া নবকান্তের সঙ্গে চলিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। মাঠের মাঝে দুই একজন কৃষক গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল. আকাশের গায় নক্ষত্রগুলা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। অদূরে বনানীর অন্তরালে চন্দ্রদেবের উঁকি ঝুকি মারা মুখখানা ও কচিৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তখন যেন কার একটী

সৌন্দর্য্য স্মৃতি বুক ভরিয়া ব্যথা জাগাইয়া অন্তরে গুমরাইয়া উঠে, যেন কত কি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথা আপনি জাগিয়া উঠে, মনটা তখন আর একলা থাকিতে চায় না।

নবকান্ত সুশীলের হাত ধরিয়া বলিল—"বাড়ীর খবর ভাল?" সুশীল বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"জানি না!"

নবকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—নিশ্চয় জান, নহিলে কাঁদলে কেন ভাই!"

"কাঁদলাম কেন? তুমি কি বুঝবে নব! জীবন গ্রন্থি আজ ছিন্ন হয়ে গেছে, দস্যু তস্করে সুরমাকে চোখের উপর হরণ করে নিয়ে গেছে, অনাথিনী শ্বশ্রুঠাকুরাণী বিপদের কোলে আশ্রয় নিয়েছেন, পিতাকে শয্যাগত দেখে এসেছি, তারপর ক্ষুদ্র জমীদারী ও আজ শত্রুহস্তে খেলার বস্তু হয়ে পড়েছে। দিন দিন সমস্তই যেতে বসেছে। তাই বলছি এখন যে কি হয়েছে তার কিছু জানি না!"

নবকান্ত ক্ষণৈক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আর তোমরা বেশ নিরিবিলি চুপ করে বসে আছ! স্নেহ প্রীতির বেশ নমুনা দেখালে ত!"

সুশীল আকুল হইয়া বলিল—"সত্য ভাই! তার উপর সন্দেহ করে তাকে কত কুকথাই না বলেছি, চুপ করে ছিলেম. খোঁজ করি নি, তার সেই একনিষ্ঠ প্রেমপূর্ণ সাধু হৃদয়টাকে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেম, যে সময়ে সন্দেহ দূর হ'ল, সে সময়ে হয়ত সুরমা আমাদের বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের সতীত্বের ডঙ্কা বাজিয়ে স্বর্গে চলে গেছে! বাঁকি আছে কেবল আমার প্রাণটা তার পায়ের তলায় পৌছিয়ে দিতে! বল্‌তে পার নব! প্রাণটা দিলেও তাকে পাওয়া যাবে কি না?" সুশীলের সেই আকুল প্রাণটা

যেন তাহার বিস্ফারিত রক্ত চক্ষুর দ্বার দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছিল।

নবকান্ত হাঁসিয়া বলিল—"বড কথাই বল্লে! প্রাণ ত অনেকেই দিতে পারে, কিন্তু আজীবন একনিষ্ঠ হ'য়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভার বহন করে উন্মুখ হয়ে সুরমার যদি সাধনা কর্‌তে পার তবে হয় ত সিদ্ধি লাভ হতে পারে।

সুশীল কাঁদিয়া বলিল—"তবে তাকে আর জীবনে পাব না? সে যদি পৃথিবীর অতীত হয়ে থাকে, তবে নবকান্ত! এযে কেবল শুধুই সাধনা!"

নবকান্ত জ্বলিয়া উঠিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"দানবের অত্যাচারে সে যদি কেবল তোমার মুখপানে চেয়ে স্বর্গে গিয়ে থাকে, তবে তুমি ও কি তার স্মৃতি নিয়ে তাকে ধ্যান করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে না!"

সুশীল উত্তেজিত হইয়া অশ্রুকণ্ঠে বলিল—"পার্‌ব, নিশ্চয়ই পারব।"

নবকান্ত হাঁসিয়া বলিল—"পারতে হবে না, আমার সঙ্গে এস, তাকে পাবে।"

সুশীল নবকান্তের পায়ে আছড়াইয়া পড়িল।

(১৪)

রমাকান্ত মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রভাবতীর উদ্দেশে চলিয়াছে। অন্ধকারময় রাত্রির আচ্ছাদনে প্রকৃতিদেবী লুকায়িত। চারিদিকেই কালিমা, চারিদিকেই যেন পৃথিবীর পাপরাশি জমাট বাঁধিয়া কালো মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে।

প্রভাবতীর সঙ্গে তাহার মিলনের একটী নির্জ্জন বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রভাবতীর সেখানে অভিসারে আসিবার কথাটা হরিমতীই রমাকান্তকে মনোহর ভাষায় বলিয়াছিল। সব প্রস্তুত। সম্মুখে একটা নির্জ্জন বাগান বাড়ী, বাগানের মধ্যে নিবিড় নিস্তব্ধতার ভিতরে একটা ঘরে অল্প জ্যোতি একটা আলোক জ্বলিতেছিল। হরিমতী আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া রমাকান্তকে বসাইল।

রমাকান্ত সাগ্রহে বলিল—"প্রভাবতী এখনও আসিনি হরিমতি ?"

হরিমতী। তিনি এসেছেন, ঐ ঘরে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু তিনি একটা কথা বলেছেন, সেই কথার জবাব না পেলে দেখা করবেন না ?"

"কি কথা হরিমতি! এখন ত আর তাহাকে আমার কিছু অদেয় নেই!"

হরিমতী হাঁসিয়া বলিল—"সে কথা তিনি জানেন বলিয়াই আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে,—"সে দিন রাত্রিকালে সুশীল বাবুকে দেখে হঠাৎ পালিয়ে এসে তাঁর চরিত্রে যে আপনি কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহাকে আবার অগ্য আপনারই শরণ গ্রহণ করতে হয়েছে, এর মূল্য আপনি তাঁকে কি দেবেন ?"

রমাকান্ত হাঁসিয়া বলিল—"হরিমতি! তোমাকে সব কথাই বলা ভাল! আমি যে অন্যায় করে প্রভাবতীর জন্য হরিহর বাবুর অর্দ্ধেক জমীদারী নিলাম করে নিলাম; আমি যে সুশীলকে পত্র লিখে প্রভাবতীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিবার জন্যই এনেছিলাম; আমিই যে নবকান্তের সঙ্গে পরামর্শ করে হরিহর বাবুকে সরাইয়া ছিলাম; আর জান কি হরিমতী আমিই যে নবকান্তের সঙ্গে পরামর্শ করে সুরমার মাকে সরাইয়া তাহার ঘরে আগুন দিয়েছিলেম? আমি যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে প্রভা-

বতীর জন্য এত করিলাম ; তার মূল্য তিনি কি দেবেন একবার জিজ্ঞাসা করেছ কি ? গায়ে গায়ে শোধ গেছে হরিমতি ! আমি আর কোন কথা শুন্‌তে চাইনে, আজ প্রভাবতীকে চাই !"

পার্শ্ব হইতে কর্কশকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"এই যে প্রাণনাথ ! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি।" সুশীল দৌড়াইয়া আসিয়া রমাকান্তকে জড়াইয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, পুলিশ সার্জ্জন, পুলিশ ইনস্‌পেক্‌টর চারিজন কনষ্টেবল বাহির হইয়া আসিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের ইঙ্গিতে রমাকান্ত বন্দী হইল।

ক্ষণপরে কোথা হইতে নবকান্ত দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—"সাহেব আমিই নবকান্ত ! আমাকে গ্রেফ্‌তার করুন।"

রমাকান্ত তার স্বরে বলিল—"সাহেব ! এই এই নবকান্ত ! এই আমাকে কুপথে চালিয়েছে। একে আগে বন্দী করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রক্ত চক্ষে বলিলেন—"চোপরাও বদ্‌মাস্‌ !"

সঙ্গে সঙ্গে নবকান্ত আসিয়া জানু পাতিয়া জোড় করে বলিল—"সত্য ধর্ম্মবাতার ! আমিই এই পাপের মূল !"

তৎক্ষণাৎ নবকান্তও বন্দী হইল। সুশীল তাহাকে ছাড়াইতে পারিল না।

(১৫)

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে রমাকান্তের সেই সেই অপরাধে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বিহিত হইল। হরিহরের যে সমস্ত জমীদারী কালীকান্ত রায় নিলাম করিয়া লইয়াছিলেন, সেই সমস্তই হরিহর ফিরাইয়া পাইলেন। সুরমার চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে নবকান্ত মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু সে আর

গৃহে থাকিল না। এক দিন প্রাতে সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার আর কেহ খোঁজ পাইল না। হরিমতী প্রভাবতীর দয়ায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

একদিন সুরমা হাঁসিতে হাঁসিতে সুশীলকে বলিল—"বল দেখি মেয়ে মানুষ বড় কি পুরুষ মানুষ বড় ?"

সুশীল সুরমার চিবুকটা একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল—"নিজের সতীত্বের কথা উদ্দেশ করে কি গর্ব্ব প্রকাশ করা হচ্ছে নাকি ? অতটা ভাল নয়। আমি তোমার স্বামী, শাস্ত্র ও সমাজ আমাকে বড় করে দিয়েছে। সে হিসাবে পুরুষই বড়।"

সুরমা সুশীলের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ক্ষমা কর তুমি! আমি বুদ্ধিহীনা অবলা, নারীর সতীত্বের গর্ব্ব ছাড়া সংসারে আর কিছুই নাই। সতীত্বই যে তার ইহ পরকালের সর্ব্বস্ব। সেই সর্ব্বস্বেরও মূল স্বামী, আমি তোমার সেই আরাধনার বস্তু সতীত্বের গর্ব্ব নিয়ে তোমার উপর উঠ্‌তে গিয়েছিলেম, তোমার চেয়ে বড় হতে চেয়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।" সুরমা কাঁদিতেছিল।

সুশীল বিস্মিত হইয়া—অবাক্ হইয়া হইয়া সুরমার দিকে চাহিয়া রহিল, পরে তাহাকে উঠাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"আমারও ভুল ভেঙ্গেছে সুরমা! আমি তোমার কাছে কত ছোট, তা' আজ বুঝতে পারলাম। আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশে তোমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছিলাম, আবার তুমিই আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করবে বলেছিলে। কখনও আমার প্রতি বিশ্বাস হারাও নাই। শাস্ত্র ও সমাজ মানুষকে অধিকার হিসাবে বড় করিলেও ইহা সত্য যে পুরুষ হৃদয় অপেক্ষা নারী হৃদয়

অনেক উচ্চে—আজ আমি তোমার কাছে পরাজিত, তুমি দেবী তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

পার্শ্ব হইতে একটা উচ্চ হাঁসির স্বর লহরী সুশীল ও সুষমাকে অবাক্ করিয়া দিল। প্রভাবতী আসিয়া তেমনি হাস্য ভরে বলিল—

"তুমি বড় ভাই, নচেৎ আমার কাছেও তোমাকে ক্ষমা চাইতে বল্‌তুম।

কিন্তু আমার কাছেও তোমাকে পরাজয় স্বীকার কর্‌তে হবে।"

সুশীল বলিল—"নিশ্চয়।"

কিছুদিন পরে, যেখানে প্রভাবতীর চরিত্রের উপর সুশীল কলঙ্ক লেপন করেছিল, সেইখানে একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভ গাথা রহিয়াছে দেখা গেল। তাহার গাত্রে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—"পরাজয়"।

পত্র লেখা।

(১)

ম্লান মুখে চন্দ্রদেব স্ত্রী রোহিণীর নিকট আসিয়া—অতি কাতরভাবে বলিলেন,—"শুনেছ রোহিণি!"

রোহিণী স্বামীর সেই দীন শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া—কি যেন একটা অরুন্তুদ বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া বলিল—"না না শুনিনি, শুনে কাজ নাই। তোমার অসুখ করেছে কি?"

চন্দ্রদেব ম্লান হাস্তে বলিলেন—"তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না রোহিণি! তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি।"

রোহিণীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ প্রবাহ ঢালিয়া দিল, সে তখন অবশ হইয়া স্বামীর কোলে ঢলিয়া পড়িল—তাহার তখন বাক্‌শক্তি ছিল না।

চন্দ্রদেব ব্যথিত হইয়া রোহিণীর গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"কি কর্‌ব বল, তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে আমার যে কি কষ্ট হবে তা' তুমিও কি জান না? আমার কপাল দোষে আজ মর্ত্তে জন্ম গ্রহণ কর্‌তে হবে। মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুত্র পুণ্ডরীক আমাকে শাপ দিয়েছে।"

রোহিণী উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"শাপ দিয়েছে? কেন তুমি তার কি করেছিলে? নিশ্চয়ই সে ভুল করেছে।"

"ভুল করে নি, সে দিন পূর্ণিমা তিথি ছিল, আমার শীতল কিরণে জগদ্ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, পুণ্ডরীক তখন একটী সুরম্য উদ্যানে শীতল

শিলাতলে শয়ন করে মহাশ্বেতার বিরহে প্রাণত্যাগ করছিল। আমার শীতল কিরণও তাহার গায়ে তখন অগ্নিবৃষ্টি করছিল। সে তখন আমাকে অভিসম্পাত দিলে,—"দুরাত্মা চন্দ্র! আমি যেমন প্রিয়ার আগমন আশায় উন্মুখ হয়েও কেবল তোর কিরণে সন্তাপিত হয়ে প্রাণত্যাগ করলাম, তুমিও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে এই ভাবে জন্মে জন্মে অতিশয় হৃদয় বেদনা অনুভব করে জীবন ত্যাগ করবে।"

রোহিণী স্তব্ধ হইয়া স্বামীর কথাগুলি শুনিল—ক্ষণেক পরে বলিল—"তারপর!"

"তারপর—আমিও নিরর্থক শাপাগ্নিতে জ্বলিত হইয়া তাহাকে প্রতি-শাপ দিলাম—"আমার ন্যায় তোমারও জন্মে জন্মে দুঃখ সুখ হইবে।" পরক্ষণেই আমার বিবেক ফিরিয়া আসিল,—ভাবিলাম ছিঃ ছিঃ করিলাম কি! আমারই বংশে গৌরীর গর্ভে মহাশ্বেতার জন্ম হইয়াছে, সেই মহা-শ্বেতার স্বামী পুণ্ডরীক তাহাকে আমি শাপ দিলাম! উপায় নাই, অবশ্যই সে আমার সঙ্গে মর্ত্ত লোকে বারদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবে, যতদিন না পুণ্ডী-রকের শাপে অপনীত হয়, ততদিন ত মহাশ্বেতা কষ্ট পাইবে ভাবিয়া—তাহাকে পুণ্ডীরকের সঙ্গে পুনর্মিলন হইবে বলিয়া আশ্বাসিত করিলাম এবং পুণ্ডরীকের দেহটা পাছে নষ্ট হয় ভাবিয়া তুলিয়া আনিয়া আমার 'মহোদয়া' নামক সভায় স্থিত চন্দ্রকান্তময় পর্য্যঙ্কে স্থাপিত করিলাম। এইমাত্র সমস্ত শেষ করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি—আমাকে এখনি যাইতে হইবে—বিদায় দাও।" চন্দ্রদেবের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া

রোহিণী দৃঢ় হইয়া অশ্রু মুছিয়া বলিল—'না না, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, আমিও তোমার সঙ্গে যাব!"

চন্দ্রদেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সে কি রোহিণি!—আমার সঙ্গে কোথায় যাবে? আমাকে ত পাবে না?”

“তোমাকে না পাই, তোমার আদর না পাই, ভালবাসা না পাই, স্ত্রী বলে তুমি আমাকে চিন্‌তেও না পার, আমি ত তোমাকে দেখ্‌তে পাব, আমি ত ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারব—তাতেই হবে! আমি বেশী চাই না, এইটুকু অনুগ্রহ কর।” রোহিণী চন্দ্রদেবের পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রদেব মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—“এত ভালবাস রোহিণি! এখানকার সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করে, কোথায় কোন স্থানে অরুন্তুদ যাতনা নিয়ে আমার দিকে মাত্র চেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিবে? তাতে কি সুখ রোহিণি!”

রোহিণী দৃপ্তস্বরে বলিল—“শৈশব থেকে ত তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে শিখিনি, তুমিই যে আমার সুখময়, তুমি যদি ছেড়ে যাও তবে এ জগতে সুখ কোথায়? আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাব, তোমার স্নেহ ভালবাসা পাই বা না পাই—তোমার সঙ্গে থাক্‌ব।”

চন্দ্রদেব রোহিণীর সেই আত্মহারা হৃদয়ের কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

(২)

উজ্জয়িনীর রাজভবনের উপর দিয়া তখনও সূর্য্যদেব আপনার আরক্ত কিরণ রাশি সঞ্চারিত করেন নাই, তখনও দিগ্বধূ ফুল্লগণ্ডে হাঁসির ফোয়ারা লইয়া—আপন স্বামীর অভ্যর্থনার জন্য মনোহর সজ্জায় ভূষিত হন নাই। পক্ষি-কুলের পঞ্চমতান তখনও রাজপুরীতে বিরহীদিগের অতৃপ্তকর্ণে প্রভাতের সূচনা ঘোষণা করে নাই।

ছিন্ন-হার

রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় তখন শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে ছিলেন। গুরুগৃহের শিক্ষা দীক্ষা তাঁহার তরুণ অন্তঃকরণে বেশ সজাগ ছিল। পিতৃবৎ পূজ্য মন্ত্রী শুকনাসের উপদেশ-বাণী তাঁহার হৃদয়টা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়নের মত অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব তাঁহার জীবনের পরতে পরতে স্নেহ প্রীতির অভিনব তরঙ্গ তুলিতেছিল। পিতার স্নেহ, মাতার আদর, প্রজাগণের ভক্তিপ্রবাহ তাঁহার জীবনটাকে যেন মাতাইয়া তুলিতেছিল। প্রাতঃকৃত্যের অবসানে কুমার এই সব কথাই ভাবিতেছিলেন। তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ কঞ্চুকী একটী নবীনা অনবদ্য-সুন্দরী কিশোরীকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

কিশোরীর মুখমণ্ডলে একটা অবগুণ্ঠন দেওয়া ছিল, তথাপি তাহার রূপপ্রভায় যেন সেই গৃহটী আলোকিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেন আজ রাহুর ভয়ে ভুবনে অবতীর্ণা, রাজকুললক্ষ্মী যেন চন্দ্রাপীড়ের নিকট উপস্থিতা। চন্দ্রাপীড় সেই সুন্দরীর ঘন কম্পিত, লজ্জাসঙ্কুচিত বিহ্বল অঙ্গলতার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া যেন কোন অনির্দ্দেশ্য চিন্তা স্রোতের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিলেন।

কঞ্চুকী বলিল—"কুমার! আপনার মাতা দেবী বিলাসবতী আজ্ঞা করিতেছেন যে—মহারাজ পূর্ব্বে কুলূতরাজধানী জয় করিয়া কুলূতেশ্বর রাজার কন্যা এই পত্রলেখাকে বন্দী-জনের সহিত এখানে আনিয়া ছিলেন। তখন এই কন্যা বালিকা ছিল। আমি ইহাকে অনাথা মনে করিয়া কন্যানির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে তুমি ইহাকে তোমার 'তাম্বূলপাত্রবাহিনী' কর—এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিলাম। সাধারণ পরিজনের ন্যায় তুমি ইহাকে দেখিও না, বালার ন্যায় লালন

করিবে, নিজের চিত্তবৃত্তির ন্যায় ইহাকে চাপল্য হইতে তাড়না করিবে, শিষ্যার ন্যায় দেখিবে, সুহৃদের ন্যায় সমস্ত বিশ্বাস ইহার প্রতি স্থাপন করিবে। আমার মনে হয়, এই কন্যা অল্প দিবসের মধ্যেই বিনীত স্বভাবে তোমার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।"

কঞ্চুকী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কঞ্চুকী বিদায় গ্রহণ করিল।

পত্রলেখা তখন ভিত্তিগাত্রে নিজের শিথিল দেহ-ভার রক্ষা করিয়া অবশ-ভাবে কুমারের পদপ্রান্তে দৃষ্টিস্থাপন করিয়াছিল।

কুমার সস্পৃহনয়নে পত্রলেখার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বলিলেন—"আমার কাছে থাক্‌তে পারবে?"

পত্রলেখা ঈষৎ অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রাপীড় আবার বলিলেন—"লজ্জা কর না, আমাকে তুমি আজ থেকে বন্ধু বলে জান্‌বে, আমাকে তুমি পর ভেব না, আমি তোমাকে কোন দিন কষ্ট দেব না। ও কি! তুমি কাঁদছ কেন? ছিঃ ছিঃ আমার কাছে থাক্‌তে কি তোমার কষ্ট হবে?" কুমার দাঁড়াইয়া উঠিয়া আদর-ভরে পত্রলেখার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন।

পত্রলেখা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাষ্পকণ্ঠে বলিল—"না না আমার কিছু কষ্ট হবে না—তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমাকে তোমার পার্শ্বে স্থান দিও।"

চন্দ্রাপীড় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে ভয় কর না, আজ থেকে তুমি আমার কন্যা, সখী, মন্ত্রী, শিষ্যা, ভগিনী,—তুমি কিছু ভয় কর না।"

পত্রলেখা ধীরে ধীরে আসিয়া রাজপুত্রের চরণে প্রণাম করিল।

দুই এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজলও চন্দ্রাপীড়ের চরণে সেই অবসরে পড়িয়া পত্রলেখার হৃদয়ের কি যেন একটি ব্যথার বহিশ্চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিল।

রাজপুত্র তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন—"তোমার কি কিছু দুঃখ আছে পত্রলেখা!"

পত্রলেখা চক্ষু মুছিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"না"।

(৩)

কুমার চন্দ্রাপীড় পিতাকর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে তাঁহার প্রিয়বন্ধু মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন ও পত্রলেখা চলিল। অন্যান্য অনেক রাজগণ ও সৈন্য সামন্তও চলিল। অনেক দেশ জয় করিয়া কুমার চন্দ্রাপীড় অবশেষে হেমকূট পর্ব্বতের সন্নিধানে গন্ধর্ব্ব রাজ্যের নিকটে সুবর্ণপুরে শিবির স্থাপন করিলেন। একদিন সেই থানে তাঁহার সঙ্গে বৈশম্পায়ন ও পত্রলেখার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

পত্রলেখা সাগ্রহে বলিল—"তারপর!"

কুমার বলিলেন—"তারপর মহাশ্বেতা বলিলেন—যে অপ্সরা বংশের কথা আপনাকে বলিয়াছি—সেই বংশে মদিরা নামে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ সেই কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন—তাঁহাদের ঔরসে আমার সখী কাদম্বরীর জন্ম হয়। জন্মের পর হইতে একসঙ্গে ক্রীড়া প্রভৃতিতে সে আমার দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপ হইয়া উঠিল। সেই কাদম্বরী আমার বিষাদ-বৃত্তান্ত শ্রবণে শোকাকুল চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—যতদিন মহাশ্বেতা শোকাকুল থাকিবে, ততদিন আমি বিবাহ করিব না। অধিক কি—সে বলিয়াছে যে, যদি পিতামাতা

আমার অনিচ্ছা জানিয়াও বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, তবে আমি আত্মহত্যা করিব। কুমার! আমরা কেহ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার এই নির্ব্বন্ধ দূর করিতে পারি নাই। হেমকূট পর্ব্বত অতি রমণীয়. গন্ধর্ব্ব রাজধানীও অতি রমণীয়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে এক দিন মাত্র সেখানে থাকিয়া আমার সখীকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিবেন।"

পত্রলেখে! আমি ত তাহার কথায় অসম্মত হইতে পারিলাম না, হেমকূটে গমন করিলাম। হেমকূটের সৌন্দর্য্য তোমায় কি বলিব, শত মুখে বর্ণনা করিলেও তাহার শেষ হয় না। তারপর কাদম্বরীর গৃহে গমন করিয়া তাহাকে দেখিলাম—সে এক অপূর্ব্ব। সে তখন একখানি মহার্ঘ্য নীল কাপড়ে আচ্ছাদিত পর্য্যঙ্কের উপর উপবিষ্ট ছিল। তাহার পার্শ্বে কত সুন্দরী কন্যা সকল উপবিষ্ট ছিল। নানা ঐশ্বর্য্য, নানা শোভা সমৃদ্ধির মধ্যে পরিবেষ্টিত তাহাকে তখন রাজলক্ষ্মীর মতই দেখাইতেছিল। সে তখন আমাদের প্রেরিত সংবাদবাহককে—"সে কে, কাহার পুত্র, কি নাম, তাহার কি রকম রূপ, কত বয়স, কি বলিল—তুমিই বা কি বলিলে—কতক্ষণ তাহাকে দেখিলে, সে কি এখানে আসিবে--" প্রভৃতি আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। আমরা যে সেখানে তখন ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম তাহা টের পায় নাই। সেই অবস্থায় কাদম্বরীকে দেখিয়া আমার হৃদয় সমুদ্রের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত হইল। আমি এই বিধাতৃ-নির্ম্মিত নূতন সৌন্দর্য্য-রাশি দেখিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না, তখন তাহার চক্ষুও আমার উপর পতিত হইল। জানি না কি জন্য প্রথমে তাহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল, পরে অলঙ্কারের শব্দ শুনিতে পাইলাম, শেষে কাদম্বরী দাঁড়াইয়া উঠিল। তখন তাহার গাত্রে স্বেদস্রুতি হইতেছিল, শরীরের উৎকম্প তাহার গতিকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা তাহার বক্ষঃ

স্তনের বস্ত্র চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে তখন বক্ষে হাত দিয়া কি যেন ব্যথা অনুভব করিল। ক্ষণপরে তাহার চক্ষুতে হঠাৎ অশ্রু দেখা দিল, কর্ণে তাহার একটী ফুল ছিল তাহার রেণু বোধ হয় চক্ষে পড়িয়াছিল, সে সেটাকে কর্ণ হইতে ফেলিয়া দিল, লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্তও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কথা বলিতে পারিতেছিল না, ভাল করে চাহিতেও পারিতেছিল না। ক্ষণপরে সে সেই ভাব সামলাইয়া লইয়া দ্রুত আসিয়া মহাশ্বেতাকে জড়াইয়া ধরিল। মহাশ্বেতা তখন তাহাকে আমার পরিচয় দিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে বলিলেন। আমি তখন কাদম্বরীকে অভিবাদন করিলাম। কাদম্বরী আমার দিকে বক্র কটাক্ষে চাহিয়া মৃদু হাস্যে জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। তখন পরিজনেরা আমাকে একটী পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইল।

মহাশ্বেতা বলিলেন—"সখি! কুমার চন্দ্রপীড় নূতন আগত অতিথি-স্বরূপ, অতএব ইহাকে আমাদের সকলেরই আরাধনা করা উচিত; স্নুতরাং তুমি ইহাকে স্বহস্তে তাম্বূল অর্পণ কর।"

কাদম্বরী লজ্জিত হইয়া অব্যক্তস্বরে বলিল—'সখি! আমি লজ্জিত হইতেছি, আমার সঙ্গে পরিচয় নাই,—তুমিই দাও।" মহাশ্বেতা শুনিলেন না। তখন কাদম্বরী স্থূল স্থূল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, স্বেদজলে প্লাবিত হইয়া, আমার দিকে শিথিল কম্পিত হস্ত খানা আগাইয়া দিল। তখন তাহার হস্তে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি আমার হস্ত স্পর্শলোভে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। আহা সে কি স্পর্শ সুখ! যেন সেই হাত-খানা আমাকে বলিয়া দিল—"এই নাও—এই তোমার দাসী, আজ থেকে তোমার হস্তে ইহার জীবন।" পত্রলেখে! সেই স্পর্শ এখনও সজাগ হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে এই কথাই যেন বড় করিয়া বলিয়া দিতেছে।

আমি তখন তাম্বুল গ্রহণ করিলাম। কিন্তু তার হাত থেকে যে কখন সুবর্ণ বলয়টা খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সে টের পায় নাই।" কুমার বলিতে বলিতে অন্যমনস্কে যেন কি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

পত্রলেখা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্পকণ্ঠে বলিল— "তারপর!"

(৪)

চন্দ্রাপীড় ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তারপর রাজা চিত্ররথ মহাশ্বেতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাশ্বেতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাদম্বরীকে বলিলেন—"সখি! কুমার চন্দ্রাপীড় আজ কোথায় থাকিবেন?"

কাদম্বরী হাসিয়া বলিল—"সখি! মহাশ্বেতে! তুমি এইরূপ বলিলে? কুমারের দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের শরীরের প্রতি ও আমি এখন প্রভু নই—বাড়ী ঘর পরিজনের কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহার যেখানে অভিপ্রেত হয় সেখানে থাকিবেন।"

তাহা শুনিয়া মহাশ্বেতা একটু হাস্য করিয়া বলিলেন—"তা' হলে তোমার প্রাসাদের নিকটে ক্রীড়া পর্ব্বতের উপরিস্থ মণিগৃহে ইনি থাকুন।"

মহাশ্বেতা আমাকে ইঙ্গিত করিয়া রাজদর্শনে গমন করিলেন। আমিও মহাসমাদরে নানা কন্যাজন-পরিবৃত হইয়া সেই মণিগৃহে উপস্থিত হইলাম। সেই মণি-গৃহ হইতেই কখন দেখিলাম,—কাদম্বরী পরিচারিকা প্রভৃতির সহিত বীণা বেণু বাদ্য-সহকারে বিরহসঙ্গীত গান করিয়া আকাশ বাতাস

কম্পিত করিয়া তুলিতেছে, কখনও বা একাকিনী নিজে নিজেই অসম্বদ্ধ প্রলাপবৎ কথা বলিয়া লজ্জিত হইতেছে। কখনও বা বিনয় দ্বারা তিরস্কৃত, মুগ্ধতা দ্বারা বিড়ম্বিত, কুমারীভাব দ্বারা আমন্ত্রিত, মহত্ত্ব দ্বারা গর্ব্বিত, আচার দ্বারা তর্জ্জিত, অভিজাত্য দ্বারা অনুশাসিত, ধৈর্য্য দ্বারা বিকৃত, কুলমর্য্যাদা দ্বারা যেন নিন্দিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তরিত হইতেছে। তাহার সেই ভীতত্রস্ত, লজ্জাসঙ্কুচিত, প্রেম-স্ফুরিত, মুগ্ধ মুখখানি দেখিয়া আমিও যেন একভাবে আক্রান্ত হইয়া, কি এক আবেশে যেন জড়িত হইয়া তাহার উদ্দেশে কখনও বা অগ্রসর, কখনও বা পশ্চাৎপদ হইয়া সেইখানে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলাম। রাত্রিকালে সেই মণি-গৃহেই উপাধানের উপর অবশ মস্তকটাকে ছাড়িয়া দিয়া কত কি যে ভাবিলাম তাহার সীমা নাই। 'কাদম্বরীর এই সমস্ত বিলাস কি তাহার স্বভাব! অথবা আমার দর্শনে তাহার এই বিকার!' তাহার সেই সরাগ, সাশ্রু তির্য্যগ্‌চালিত চক্ষু—তাহার সেই মন্দস্মিত লজ্জাগোপিত মুগ্ধ হাস্য—তাহার সেই সুধাক্ষরিত ছলপূর্ণ কথার ভঙ্গীগুলি সমস্ত রাত্রি আমার চক্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাকে যেন আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

পর দিন প্রভাতে কাদম্বরীর সহচরী মদলেখা যোগ্য পরিজনে পরি-বেষ্টিত হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল।

মদলেখার হস্তে একটী কারুকার্য্যখচিত ক্ষুদ্র বাক্স ছিল, সেই বাক্সের মধ্যে একটী মহামূল্য হীরকনির্ম্মিত হার ছিল। সে সেই হারটী বাহির করিয়া আমাকে বলিল,—

"কুমার! আপনার মত মহানুভবের সাক্ষাৎ পাইয়া আমরা ধন্য। আপনার এই আকার, আপনার এই ব্যবহার, আপনার এই গুণাবলী

আমাদিগকে অত্যন্ত বশীভূত করিয়া তুলিয়াছে। আপনার যোগ্য অর্চনা আমাদের সাধ্যাতীত, আপনার প্রতি প্রীতিপ্রকাশ অনাত্মজ্ঞতা, আপনার নিকট কিছু বিজ্ঞাপনা প্রগল্‌ভতা, আপনার সেবা চাপল্য, দান গর্ব্ব। আর আপনাকে দিবই কি, আপনিই ত আমাদের সব! আর এই সমস্তও ত গুণে আপনি আপনার করিয়া লইয়াছেন। তথাপি দেবী কাদম্বরী আপনার সমুচিত আদর করিতে না পারিয়া অপরাধিনী হইয়াছেন, অতএব এই সর্ব্বরত্নের ও শ্রেষ্ঠ 'শেষ' নামক হারছড়াটী গ্রহণ করিয়া দেবীর অপরাধের কথাটাও স্মরণ রাখিবেন, ইহাই প্রার্থনা।" এই বলিয়া মদলেখা সেই হার ছড়াটা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিল।

আমি ত বিস্ময়স্তম্ভিত চিত্তে ক্ষণৈক অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমার ত কিছুই বলিবার ছিল না, তথাপি তৎকালোচিত দুই এক কথা বলিয়া বহু সম্মানে সেখান হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। সখা! পত্র-লেখে! এই সেই হার!"

পত্রলেখা সেই দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেশ!"

(৫)

সেই দিন রাত্রে কুমারের কাদম্বরী ছাড়া আর অন্য কোন বিষয় ভাবিবার বা দেখিবার ছিল না। নয়নে নিদ্রা নাই—কিন্তু আছে কাদম্বরী; মুখে কাহার সহিত অন্য আলাপ ছিল না, কিন্তু কাদম্বরীর কথাই জপমালা হইয়াছিল; হৃদয় শূন্য, কিন্তু কাদম্বরীর ছবি পূর্ণ; চিন্তা অসম্বদ্ধ, কিন্তু কাদম্বরীর লক্ষে সংবদ্ধ হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে কাদম্বরীর দূত কেয়ূরক আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে সে কুমারকে প্রণাম করিতে না করিতেই চন্দ্রাপীড় প্রথমে চক্ষু, পরে হৃদয়, তার পর রোমাঞ্চ, তদন্তর বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে আদর করিয়া উঠাইয়া বসাইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেয়ূরক মঙ্গল সমাচার দিয়া বলিল—"দেবী মহাশ্বেতা কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিয়াছেন—আপনি যাহাদের দর্শন পথে পতিত হন নাই, তাহারাই ধন্য—কারণ তাহারা আপনার বিরহে কষ্ট অনুভব করে না। আপনি যাওয়ার পর হইতে সমস্ত গন্ধর্ব্বনগর মহোৎসবশূন্য হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ দেবী কাদম্বরী নিতান্ত অসুস্থা, অতএব আপনি একবার আসিবেন। জানি না কেন যে আমাদের চিত্ত আপনার দর্শনে পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই পরিচয়-পীড়া আপনি ক্ষমা করিবেন।"

চন্দ্রাপীড় হর্ষগদ্‌গদকণ্ঠে কেয়ূরককে বিদায় দিয়া পত্রলেখার নিকট গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন।

পত্রলেখা বলিল—"তা' হ'লে কখন যাবেন?"

চন্দ্রাপীড় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কখন কি? এখনি যেতে হবে! "শুনলে না কাদম্বরীর অসুখ।"

পত্রলেখা বলিল—'হুঁ"।

চন্দ্রাপীড় আবার বলিলেন—"এবার তোমাকেও যেতে হবে। মহাশ্বেতা, কাদম্বরী প্রভৃতিকে চল দেখে আসবে।"

পত্রলেখা ও নীরবে সম্মতি দান করিল। চন্দ্রাপীড় সখা বৈশম্পায়নকে স্কন্ধাবার রক্ষার ভার দিয়া গন্ধর্ব্বনগরে গমন করিলেন।

কাদম্বরীর 'প্রাসাদের দ্বারে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই

পত্রলেখা একজন প্রতিহারীকে কাদম্বরী কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিহারী প্রণাম করিয়া বলিল—"দেবী ক্রীড়াপর্ব্বতের নীচে পদ্ম সরোবরের তীরে হিমগৃহে অবস্থান করিতেছেন।"

কেয়ূরক পত্রলেখা ও চন্দ্রাপীড়কে সঙ্গে লইয়া চলিল। পত্রলেখা সেই হিমগৃহে আসিয়া কাদম্বরীকে দর্শন করিল। কাদম্বরী অসুস্থ হইয়া পদ্মপত্রের উপর শায়িত ছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ মৃণালের আভরণে ভূষিত ছিল; কোন পরিজন তাহার অঙ্গে তুষার শীতল স্পর্শ সঞ্চার করিতেছিল, কোন পরিজন বা ব্যজন করিতেছিল. কেহ বা চন্দন, বীরণ, প্রভৃতি দ্বারা তাহার অঙ্গরাগ করিয়া দিতেছিল। ক্ষীণা অথচ লাবণ্যময়ী, শীর্ণা অথচ দীপ্তিময়ী, কাতরা অথচ মনোহারিণী সেই কাদম্বরী তখন সখীজনের সহিত সোৎকণ্ঠচিত্তে কি যেন আলাপ করিতেছিল।

চন্দ্রাপীড় সেখানে প্রবেশ করিয়া বিনয় নম্রমস্তকে সকলকে প্রণাম করিলেন। সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল, প্রণাম করিল, যোগ্য আসনে উপবেশন করাইল।

কেয়ূরক বলিল—"দেবি! দেব চন্দ্রাপীড়ের অনুগ্রহপাত্রী এই পত্রলেখা! ইনি দেবের তাম্বূলপাত্র-বাহিনী।"

কাদম্বরী পত্রলেখার দিকে চাহিয়া কি যেন মনে মনে চিন্তা করিল, পরে তাহাকে আদর করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইল। পত্রলেখার দর্শনাবধি কাদম্বরীর মনে যেন কি একটা ভাব সঞ্চারিত হইল। কখনও তাহার হাতখানা লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল, কখনও বহুক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কখনও বা তাহার গাত্রে হস্ত সঞ্চালিত করিতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে চন্দ্রাপীড় বলিলেন—"দেবি! জানি না কি নিমিত্ত আপ-

নার সন্তাপ! কিন্তু আপনার এই কাতরতা কেবল যে আপনাকেই পীড়া দিতেছে তাহা নয়, আমাকেও সাতিশয় পীড়িত করিতেছে। আমার দেহ দান করিলেও যদি আপনার ব্যথা কমে, তাহাতেও আমি প্রস্তুত, বলুন দেবি! কি প্রকারে আপনি আরোগ্য হইবেন?"

কাদম্বরী লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না; কেবল মাত্র একটু হাস্য করিয়া মদলেখার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মদলেখা বলিল—"কুমার! দেবী কি বলিবেন। এই সন্তাপ অকথনীয়। কুমারীজীবনের এই সন্তাপে বায়ু বহ্নিতুল্য, জ্যোৎস্না রৌদ্রবৎ, তুষার স্পর্শ ও অঙ্গারবদ্ উষ্ণ। জানি না ইহার কি ঔষধ আছে! বোধ হয় এক্ষণে ধৈর্য্যই চরম ঔষধ।"

চন্দ্রাপীড় আর কিছু বলিলেন না, মহাশ্বেতার সহিত নানা মধুর কথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া স্কন্ধাবার গমনের জন্য উঠিয়া পড়িলেন।

কেয়ূরক আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"দেব! মদলেখা বলিল—দেবী কাদম্বরী পত্রলেখার উপর দর্শনাবধি অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব তাঁহার ইচ্ছা পত্রলেখা এখানে দিন কয়েক যেন থাকেন।"

চন্দ্রাপীড় পত্রলেখার ভাগ্যের অনেক প্রশংসা করিয়া তাহাকে থাকিতে আদেশ করিলেন।

(৬)

সেদিন অপরাহ্নের সূর্য্য কাদম্বরীর প্রমোদবনের পদ্মসরোবরে

আপনার রক্তিম কিরণ গুলি প্রতিবিম্বিত করিয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। তখন কাদম্বরী পত্রলেখাকে সঙ্গে করিয়া সেই পদ্ম-সরোবরের তীরে একটী স্ফটিকময় বেদিকার উপর উপবেশন করিল। সঙ্গে অন্য কোন পরিজন ছিল না। বেদিকার তলদেশ দিয়া মরকত-মণি নির্ম্মিত সোপানাবলী জলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল; মন্দ মন্দ পবন হিল্লোলে, তরঙ্গ রাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া—চূর্ণ হইয়া সেই শুভ্র সোপানা-বলীর উপর আছাড় খাইতেছিল; কখন কখন স্নিগ্ধ পবন জলবিন্দু বহন করিয়া উভয়ের গাত্র শীতল করিয়া তুলিতেছিল।

কাদম্বরী কখন পত্রলেখার চক্ষুর উপর চক্ষু, ক্রোড়ের উপর মস্তক, হস্তে শিথিল হস্ত, নামাক্ষরে পুনঃ পুনঃ বাণী স্থাপিত করিয়া ক্ষণকাল অতিবাহিত করিল। ক্ষণৈক পরে দীর্ঘকাল পত্রলেখার দিকে চাহিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্বেদভরে তাহার অঙ্গযষ্টি সিক্ত হইয়া উঠিল। দেহ ও কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সেই সুন্দর মুখম্লানা বিষাদ কালিমায় আবৃত হইয়া গেল।

পত্রলেখা তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল—"বলুন!"

কাদম্বরী তখন উঠিয়া বসিয়া চরণ নখ দ্বারা ভূমিতে কি যেন লিখিতে লাগিল। বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। কথা যদি বাহির হইল, তাহার সেই গদগদ-স্বরে কিছু বুঝা গেল না। তাহার বাণী তখন কামানলে দগ্ধ হইয়া,—নয়ন জলে সিক্ত হইয়া,—দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া—কুসুমশর দ্বারা খণ্ডিত হইয়া,—নিশ্বাস দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়া—হৃদয়স্থ চিন্তা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া—কোন রকমেও প্রবর্ত্তিত হইতে ছিল না। তাহার নিকট হইতে তখন যেন লজ্জা ও লজ্জা শিখিতেছিল,—বিনয় ও বিনয়াতিশয়—মুগ্ধতা ও মুগ্ধতা—বৈদগ্ধ্য ও

বিদগ্ধতা—ভয় ভীরুতা—বিষাদ ও বিষণ্ণতা—বিলাস ও বিলাসিতা শিখিতেছিল।

পত্রলেখা তখন জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি দেবি!"

কাদম্বরী তখন তাহার দিকে লোহিতায়মান চক্ষু স্থাপন করিয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ক্রমে অতি কষ্টে বলিল,—"পত্রলেখে! তুমি দর্শনাবধি আমার এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছ যে, পিতা, মাতা, মহাশ্বেতা, মদলেখা বা আমার জীবনটাও আর তাদৃশ প্রিয় নহে। জানি না কি কারণে সমস্ত সখীজনকে ত্যাগ করিয়াও আমার চিত্ত তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে তিরস্কার করিব! কাহাকে বা নিজের পরাভবের কথা বলিব! কাহার সঙ্গেই বা নিজের দুঃখ ভাগ করিয়া লইব! এই অসহ্য দুঃখভার তোমার কাছে নিবেদন করে আজ জীবন ত্যাগ করিব! তোমার কাছে প্রাণের শপথ করে বল্‌ছি, আমার প্রাণটাকে নিয়েও আমি ভীত হইতেছি। ভাবি এই—আমার ন্যায় লোক কিরূপে চন্দ্রকর-নির্ম্মল আমার বংশধারাকে কলঙ্কিত করিল? কুল ক্রমাগত লজ্জাকে ত্যাগ করিল? কন্যাজনের অনুচিত ব্যাপারে হৃদয় কেন প্রবাহিত হইল? পিতার সঙ্গে মন্ত্রণা করিলাম না, মাতাও সম্প্রদান করিলেন না, গুরুজনও অনুজ্ঞা করিলেন না, কিছু বলি নাই, উপঢৌকন ও প্রেরণ করা হয় নাই, দেহ বিকারও দেখাই নাই, আজ কিনা কুমার চন্দ্রাপীড় আসিয়া গুরু গর্হণীয় দশা উপস্থিত করিলেন। বল—এটা মহতের কি আচার? এটা কি পরিচয়ের ফল? আজ যে আমার মনটা পরাভব প্রাপ্ত হইল? অনুরাগ প্রথমে লজ্জাকে দাহ করে, পরে হৃদয়কে; আগে কামশর বিনয়াদিকে খণ্ড খণ্ড করে, পরে মর্ম্ম! আর কি কর্‌ব—

জন্মান্তরে তোমার সঙ্গে পুনর্ব্বার মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছি। আজ প্রাণ ত্যাগ করে আত্মার কলঙ্ক ক্ষালন করিব।”

পত্রলেখা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়াও ভীত হইয়া, ত্রস্ত হইয়াই যেন, অচেতনার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল,—“দেবি! শুনিতে ইচ্ছা করি—দেব চন্দ্রাপীড় তোমার কি করিলেন?”

“কি করিলেন! কি বলিব! প্রতি দিন স্বপ্নে তিনি এসে আমাকে আশ্বাস দেন! নিদ্রা গেলে প্রহরা দেন! নিজের রক্ত অনুরাগ নিয়ে আমার পায়ে আলতা পরিয়ে দেন! বল পত্রলেখে! বল! তাঁকে কি করে নিবারণ করি? প্রত্যাখ্যান করলে ঈর্ষা মনে করেন, ক্রোধ করিলে পরিহাস মনে করেন, কথা না বলিলে মান হয়েছে মনে করেন, অবজ্ঞা করিলে প্রণয় ব্যবহার মনে করেন। লোকাপবাদ ও তিনি যশ মনে করেন।” কাদম্বরী স্থূল স্থূল নিশ্বাস ফেলিয়া পত্রলেখার দিকে রক্তনয়নে চাহিয়া রহিল।

পত্রলেখা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—“কোপের যোগ্য বটে! প্রসন্ন হউন। দেবকে দূষিত করিবেন না, এটা তাঁর দোষ নয়, প্রণয়েরই ফল।”

কাদম্বরী গদগদকণ্ঠে বলিল—“যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, বল এখন কি করা যায়? গুরুজনের নিন্দাপাত্র হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণই মঙ্গল!”

পত্রলেখা বলিল,—“বৃথা খেদ করিবেন না! আপনার অপরাধ কি? প্রণয়ই আজ আপনার পিতা, মাতা হইয়া আপনাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিয়াছে। অধিক কি বলিব—মরণের কথা ছেড়ে দিন, আপনার পাদস্পর্শ করে শপথ করে বলছি—আমি আপনার হৃদয়দেবতাকে আনিয়া দিব!”

কাদম্বরী তখন বহুমূল্য হারটা পত্রলেখার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া বলিলেন,—"তোমার প্রীতির কথা জানি, আমি বল্‌তে ভয় পাই, বালিকা লজ্জা পাই, ভীরু সাহস পাই না, তুমি আমার অতি প্রিয়! তুমি আমার অতি প্রিয়তম! অবশ্যই তুমি আসিবে!"

পত্রলেখা বলিল—"প্রসন্ন হউন, আমি এলাম বলে!" পত্রলেখা বিদায় গ্রহণ করিল।

(৭)

বনরাজিবেষ্টিত অচ্ছোদ সরোবরের তীরে আসিয়া বৈশাম্পায়ন দাঁড়াইল। তখন অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য্যালোক ক্বচিৎ বনানীর অন্তরাল ভেদ করিয়া সরোবরের বক্ষঃস্থলে পড়িয়া নাচিতেছিল। হংস, সারস প্রভৃতির পক্ষ তাড়নে তরঙ্গায়িত সলিল ও ফুলিয়া ফুলিয়া কাহার উদ্দেশে যেন নিজের প্রণয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেছিল। তীরে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পুষ্প কানন, পুষ্প কাননের মধ্যে একটী সুন্দর শিব মন্দির।

বৈশম্পায়ন অন্য কিছুই দেখিতেছিল না, সরোবর তীরস্থ পুষ্প কাননের উপর অনিমেষ নয়ন স্থাপিত করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

"একি! আমি কোথায় আসিলাম? এই পুষ্প কাননে কি কখন এসেছিলাম? এই রকম ফুলবাগান কি কোথাও দেখেছিলাম? এই সরোবর, এইরূপ সোপানাবলী, এইরূপ বনরাজিশোভিত অপূর্ব্ব সলিলরাশি কি আমার চক্ষে নূতন নয়? প্রাণটায় ভিতর এমন করে কেন? কোথা হতে যেন কি এক অভিনব আকর্ষণ এসে আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়! সেখানে যেন কেবল সুন্দর! অন্ধকার নেই, কালিমা নেই, শোক নেই, কষ্ট নেই, যেন কেবল আলো, কেবল সুখ! প্রণয়ের উদ্দাম

নৃত্য ছাড়া যেন সেখানে আর কিছু নেই। পিতা মাতা, রাজৈশ্বর্য্য সমস্তই যেন আজ আমার নিকট তুচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে। উজ্জয়িনীর সুখ শান্তি, বন্ধুর অকৃত্রিম প্রেম প্রভৃতির ত এমন আকর্ষণ নয়। ছুটে বেড়াতে ইচ্ছা করছে! উধাও হয়ে উড়ে গিয়ে যেন সেই প্রণয়ের তালে তালে ভাস্‌তে ইচ্ছা করছে! কিন্তু কোথায়? যাব কোথায়?" বৈশম্পায়ন জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ছুটিতে লাগিল।

পার্শ্ব হইতে চন্দ্রাপীড় ডাকিলেন,—"সখা!"

বৈশম্পায়ন শুনিতে পাইল না,—সে তখন অল্প দূরে আসিয়া মন্দির দ্বারে দাঁড়াইল। মন্দিরের মধ্যে অনাদিলিঙ্গ মহাদেব বিরাজমান, সে সেই দিকে চাহিয়া কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল।

চন্দ্রাপীড় নিকটে আসিয়া আবার ডাকিলেন—"সখা! তুমি কি দেখিতেছ!"

বৈশম্পায়ন বলিল—"সখা চন্দ্রাপীড়! বলিতে পার ভাই! আমি কোথায় আসিলাম?"

চন্দ্রাপীড় হাস্য করিয়া বলিলেন—"অচ্ছোদ সরোবরের তীরে এই তপোবন! এখানে মহাশ্বেতা তপস্যা করেন?"

বৈশম্পায়ন চমকিত হইয়া উঠিলেন—"কি কি? অচ্ছোদ সরোবর! মহাশ্বেতা তপস্যা করেন? কেন?"

"সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী! অনেক দিন হইল—মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুত্র পুণ্ডরীক সখা কপিঞ্জলের সঙ্গে এই অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিতে আসিতেছিলেন। অপূর্ব্ব সুন্দর পুণ্ডরীকের কর্ণে একটী পারিজাত পুষ্প ছিল, তাহার গন্ধে দিগ্বিদিক সুরভিত হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে গন্ধর্ব্ব রাজপুত্রী মহাশ্বেতা সখীজনের সহিত সেই দিন সেই সময় অচ্ছোদ সরোবরে

বিহার করিতে আসিয়াছিলেন। মহাশ্বেতা সেইখানে সেই অপূর্ব্ব গন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া ক্রীড়াচ্ছলে এদিকে আসিলেন। তাহার তখন কিশোর বয়স, সুন্দর রূপ, নবযৌবনপুষ্পিত দেহলতা যেন আশ্রয়ের জন্য উন্মুখ। সেই অবসরে পুণ্ডরীকের দর্শন। তারপর উভয়েই উভয়ের প্রতি তীব্র অনুরাগে জড়িত হইয়া পড়িলেন। পুণ্ডরীক মহাশ্বেতার কর্ণে সেই পারিজাত কুসুম পরাইয়া দিয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইলেন। হস্ত হইতে একাবলী হারটা স্খলিত হইয়া পড়িল, মহাশ্বেতাও তাহা কুড়াইয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মহাশ্বেতাকে হারাইয়া পুণ্ডরীক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন, তাঁহার তপস্যা গেল, ধৈর্য্য গেল, পাণ্ডিত্য গেল, সব গেল। কপিঞ্জল কত বুঝাইলেন, কত সান্ত্বনা দিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। তখন অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া কপিঞ্জল মহাশ্বেতাকে আনিবার জন্য ছুটিলেন। সে দিন পূর্ণিমা রজনী! চন্দ্র-করে ধরাতল শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল, চারিদিক বসন্ত সমাগমে যেন উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়ের প্রেম প্রীতি চারিদিকে ছুটাইয়া দিতেছিল, মৃদু মন্দ বায়ু ইতস্তত পুষ্পরাশি আহরণ করিয়া প্রকৃতির উন্মুক্ত ক্রোড়ে ছড়াইতেছিল। পুণ্ডরীক সেই দৃশ্যে—সেই ভাবে আকুল হইয়া একখানি শিলাতলে শয়ন করিলেন। টপ্ টপ্ করিয়া ফুল্লফুলগুলি তাঁহার গাত্রে বর্ষিত হইতেছিল। পুষ্পপরাগ সমূহ উড়িয়া আসিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। সম্মুখে জোৎস্নার উদ্দাম ক্রীড়া॥ পুণ্ডরীক আর বিরহ সহ্য করিতে পারিলেন না। মহাশ্বেতার আগমন সময় টুকু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি সেখানেই মরিয়েছেন'।"

বৈশম্পায়ন চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল,—"মরিলেন—তারপর।"

চন্দ্রাপীড় বিস্মিত হইয়া বৈশম্পায়নের সেই রক্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একি সখা! তুমি এমন হলে কেন?"

"না না—বল, বল, শেষে কি হ'ল।"

"শেষে মহাশ্বেতা আসিয়া পুণ্ডরীকের সেই অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কে যেন তাহার কর্ণে আসিয়া বলিয়া দিল—'মহাশ্বেতে! জীবন ত্যাগ করিও না, তুমি পুণ্ডরীককে আবার পাইবে!' মহাশ্বেতা তখন সেই কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন দেখিলেন পুণ্ডরীকের সেই দেহটাও সেখানে নাই, পার্শ্বে হইতে কপিঞ্জল—'আ দুরাত্মন্! চন্দ্র! আমার সখাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিস্, দাঁড়া, এই আমি যাইতেছি' বলিয়া আকাশে উঠিয়া গেল। মহাশ্বেতা তদবধি পুণ্ডরীকের আশায় এই কাননেই তপস্যা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন।" চন্দ্রাপীড় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিয়া উঠিল—"কই কই! আমার জীবনের জীবন, আমার প্রাণের প্রাণ সে কই! কোথায় তাকে পাব? বলে দাও সখা! কোথায় তাকে পাব?"

চন্দ্রাপীড় বিস্মিত হইয়া—অবাক্ হইয়া বৈশম্পায়নের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন,—'সখা তুমি কি পাগল হলে নাকি? চল বাড়ী চল! বাবা পত্র লিখে জানিয়েছেন যে তাঁহারা অনেক দিন আমাদের না দেখ্‌তে পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। তোমার বাবাও তোমাকে পত্র লিখেছেন। এই নাও সখা! সেই পত্র!"

বৈশম্পায়ন উন্মত্তবৎ পত্র পড়িয়া বলিল—"না না! যাওয়া হবে না। তুমি যাও। সকলকে আমার প্রণাম দিয়ে বল—আমি কিছু দিন পরে যাব।"

চন্দ্রাপীড় বলিলেন—"তবে এক কাজ কর, পত্রলেখা গন্ধর্ব্ব রাজ-ধানীতে কাদম্বরীর নিকটে আছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতে ভুল না। আমি তাহাদের সংবাদ দিয়াছি। সৈন্য সামন্তও তোমার নিকট রহিল। আমি আগে যাই, তুমি এদের নিয়ে যেও।"

বৈশম্পায়ন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা।"

চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রায়ুধনামক অশ্বে আরোহণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

(৮)

কাদম্বরীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্রলেখা অচ্ছোদ সরো-বরের পথে মহাশ্বেতার তপোবনে উপস্থিত হইল। তখন জ্যোৎস্না-বিচ্ছুরিত প্রকৃতি তপোবনের উপর কামনার আধিক্য বিস্তার করি-বার চেষ্টা করিতেছিল। নক্ষত্রগুলাও প্রকৃতির সাহায্য করিতে ছাড়ি-তেছিল না।

চন্দ্রপীড় যে বাড়ী গিয়াছেন তাহা পত্রলেখা জানে, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি যে তাহার অপেক্ষায় নিকটেই অবস্থান করিতেছেন তাহাও সে জানে। মহাশ্বেতার শোকোদ্দীপক বিবরণ শুনিয়া সেই তপোবন দেখার কেমন সাধ হয়, তাহা সে কাহাকেও না বলিয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। যে শিলাতলের উপর শয়ন করিয়া পুণ্ডরীক প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পত্রলেখা ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে বুকে হাত দিয়া উর্দ্ধ মুখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেকপরে তাহার সেই সুন্দর নবযৌবনোদ্দীপ্ত মুখের উপর দিয়া অশ্রুস্রোত টপ্ টপ্ করিয়া শিলাতলের উপর পড়িয়া চূর্ণ হইতে লাগিল। সে বাঁধা দিল না, মুখও ফিরাইল না।

দূরে কাহার যেন আর্ত্তনাদ শুনা গেল—"সে কই! আমার জীবনের জীবন কই! আমার মানসী প্রতিমা কই!"

পত্রলেখা হাঁসিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইল—সম্মুখে দেখিল—তাহার দিকে বৈশম্পায়ন ছুটিয়া আসিতেছে।

পত্রলেখা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া কুঞ্জের মধ্যে লুকাইল। বৈশম্পায়ন সেই শিলাতলের উপর বসিয়া বাষ্পকণ্ঠে বলিল—"একি! এখানে আমার প্রাণকে কে টানে? কোথাও ত থাকিতে পারি না! এই কানন যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আমার প্রাণের গোড়া ধরিয়া কেবলই আকর্ষণ করছে! এই মায়া—এই মরীচিকা হতে কে আমায় উদ্ধার করবে, কে আমায় বাঁচাবে। কে বলে দেবে আমি কি চাই! যাহা চাই তাহা কোথায়?"

সম্মুখবর্ত্তী এক বৃক্ষ হইতে একটী পেচক অকস্মাৎ কর্কশ কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পত্রলেখা বাহির হইয়া বৈশম্পায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনি কি চান?"

বৈশম্পায়ন অকস্মাৎ পত্রলেখার আবির্ভাবে বিমূঢ় হইয়া ভীত হইয়াই যেন বলিল,—"তুমি! তুমি এখানে কেন? বল্‌তে পার পত্রলেখে! সে কোথায়?"

পত্রলেখা হাঁসিয়া বলিল—"সে কে?"

"জানি না? এই তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী প্রণয়-দেবতা—আমার জীবন দেবতা সেই সে!"

"তাকে দেখেছেন?"

"না! কিন্তু সে অতি সুন্দর! পত্রলেখে! অতি সুন্দর!"

"অদ্ভুত বটে! কেমন করে তাকে ভাল বাসলেন?" পত্রলেখা হাঁসিয়া ফেলিল।

বৈশম্পায়ন বলিল,—"যেন কোথায় কোন জীবনে দেখেছি, যেন অতি দূর! যেন কোন সুদূর অন্ধকার পুঞ্জ হতে সদ্য নির্গত জ্যোতি-র্ম্ময়ী প্রণয়দেবতা আমার সম্মুখে এসে প্রীতির লহর তুলে দাঁড়িয়াছে। ওই ওই ওই সে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে আমার দিকে ছুটে আসছে! সৌদামিনী-মনোহরা সেই মূর্ত্তি ওই এল! শান্তি দিতে আস্‌ছে—সুখ দিতে আস্‌ছে! আলিঙ্গন কর্‌তে আস্‌ছে,—আমাকে বাঁচাতে আস্‌ছে! ওই যা কোথায় গেল! এই আসছিল—কোথায় গেল!" বৈশম্পায়ন অনিমেষনয়নে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পত্রলেখা গম্ভীর হইয়া বলিল,—"সে কাল আস্‌বে, সত্যই আস্‌বে!"

"ঐ ঐ! ঐ যে আস্‌ছে! কর্ণে একটী সুরভিসুন্দর পারিজাত ফুল ধারণ করে শ্বেতমূর্ত্তি ঐ যে জ্যোৎস্নামথিত করিয়া আমার প্রাণ আলো করিয়া ঐ যে আস্‌ছে! পত্রলেখে দেখ দেখ! ঐ যে আসছে, দেখতে পাচ্ছ না? ঐ ঐ না না কোথায় মিলিয়ে গেল!" বৈশম্পায়ন উদ্ভ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

পত্রলেখা আবার বলিল—"উদ্ভ্রান্ত হবেন না, সে আসবে, তাকে পাবেন, কিন্তু এখনও অনেক বিলম্ব! আমি ব্যবস্থা কর্‌ছি!"

"কি কি? সে আসবে? বল বল পত্রলেখে! সে আসবে,? কবে আসবে! তুমি কি ব্যবস্থা করবে?" বৈশম্পায়ন পত্রলেখার হাত ধরিতে অগ্রসর হইল।

পত্রলেখা পিছাইয়া যাইয়া বলিল—"আমাকে এখনি রাজধানীতে পাঠাইয়া দিন। রাজপুত্রকে আন্‌তে হবে। আপনি এখানে

থাকুন, কোথাও যাইবেন না। এই থানেই আপনার অভীষ্ট আসিবে!"

বৈশম্পায়ন বিস্মিত হইয়া বলিল,—"রাজপুত্রকে আনতে হবে কেন?"

"সে যে আপনার অভিন্ন-হৃদয় সখা। তাকে ছেড়ে ত আপনার অভীষ্ট পাবেন না। আপনাদের দুজনের জীবন যে একসূত্রে গ্রথিত, আপনাদের দুইজনের অভীষ্টলাভ যে এককালে এক স্থানে হবে।"

"তবে চল পত্রলেখা! তোমাকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিই, আমি এখন একা থাক্‌তে চাই।"

পত্রলেখা হাঁসিয়া বলিল—"আচ্ছা!"

(৯)

অনুলঙ্ঘ্য পিতার আদেশ মাথায় করিয়া চন্দ্রাপীড় ত গৃহে আসিলেন। কিন্তু আনিলেন অন্তরে অসীম জ্বালা। একদিকে পিতামাতার আদেশ, অপর দিকে হৃদয়—জীবন—সমস্ত সর্ব্বস্ব বলিলেও বলা শেষ হয় না। কিন্তু আজ পিতৃমাতৃভক্ত চন্দ্রাপীড়ের নিকট তাঁহার নিজের দিক্‌টা বড় ছোট হইয়া গেল। কিন্তু শান্তি ত নাই, পিতামাতার স্নেহ ত তাঁহার সেই উত্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিতে পারিল না।

সেদিন নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া চন্দ্রাপীড় এই কথাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে পত্রলেখা আসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে প্রণাম করিল। কুমার তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"পত্রলেখা! দেবী কাদম্বরীর সমস্ত মঙ্গল? মহাশ্বেতা ভাল আছেন? সকলে ভাল আছে? দেবী কি বলিলেন?"

পত্রলেখা বাষ্পদিগ্ধ চক্ষুটা কুমারের অজ্ঞাতে মুছিয়া ফেলিয়া ভিত্তি

গাত্রে নিজের দেহভার রক্ষা করিয়া ক্ষণৈক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার তখন বাহ্য জ্ঞান ছিল না, ধৈর্য্য ও বুঝি ছিল না। কিন্তু ক্ষণৈকের মধ্যে সে সেভাব সামলাইয়া লইয়া মৃদুহাস্যে কাদম্বরীর সমস্ত ব্যাপারই মধুর ভাষায় বলিয়া একটু হাঁসিয়া আবার বলিল,—"দেব! দেবী কাদম্বরীর অনুগ্রহে আজ প্রগল্‌ভা হইয়া দুঃখিতা হইয়াই বলিতেছি—আপনি একি করিলেন? তাহাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, তাহার ব্যথিত জীবনটাকে আরও ক্লিষ্ট করিয়া আপনি এ কি করিলেন?"

কুমার সমস্তই শুনিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় অনুতাপে যেন দগ্ধ হইতেছিল, প্রাণটাও কণ্ঠের নিকট আসিয়া যেন বাহিরে যাইবার পথ খুঁজিতেছিল। তাঁহার অধরের কম্প, নাসাগ্রের স্ফুরণ, চক্ষুর বাষ্প, সমস্তই মিলিয়া মিশিয়া একটা বিষাদমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তিনি কি করিবেন?

কুমার হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবেগে বলিলেন,—"চল চল পত্রলেখে! এখনি চল, দেবী কাদম্বরী যে আমার পথ পানে চেয়ে বসে রয়েছে, চল চল! ঐযে আমি তার ব্যথিত হতাশ পাংশু মুখ খানা দেখতে পাচ্ছি, ঐ যে আমি তার বিরহসন্তপ্ত কাতর পাণ্ডু দেহখানা দেখতে পাচ্ছি! আমার জন্য তাহার এই অবস্থা, আর আমি এখানে—চল চল!" কুমার তাড়াতাড়ি আসিয়া পত্রলেখার হস্তখানা ধরিয়া ফেলিলেন। পত্রলেখা বিস্ময়স্তিমিত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন কুমারের চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

কুমার আবার বাষ্পকণ্ঠে বলিলেন,—"না না! পিতা বৃদ্ধ, রাজ্য ভার আমার মাথায়, প্রজাপুঞ্জ আমার মুখ পানে চেয়ে রয়েছে। পিতা মাতা আমি চক্ষুর অন্তরালে গেলে অন্ধকার দেখেন। তিন বৎসর পরে

এই সেদিন ফিরে এসেছি। এখন কেমন করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে যাই বল দেখি?"

পত্রলেখা বাষ্পকণ্ঠে বলিল,—"তা:হলে দেবী বাঁচিবেন না—উপায়?"

"উপায় কই? আমার এই প্রেমের কথা, আমার এই দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের পরিভবের কথা নিয়ে কেমন করে পিতামাতার নিকট যাই? সখা বৈশম্পায়ন নাই, কেমন করে কথাটা তুলি বল দেখি! এদিকে বাড়ীতে বিবাহের যোগাড় হইতেছে, আর আমি পিতামাতাকে অবজ্ঞা করে অন্য স্থানে আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি!" কুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল—"গন্ধর্ব্বনগর হইতে কেয়ূরক আসিয়াছেন!"

কুমার বিস্ময়স্তম্ভিতচিত্তে আবেগাতিশয্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন —"কেয়ূরক! কাদম্বরীর সহচর কেয়ূরক! কই কই!" কুমার দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"কেয়ূরক! তুমি এখানে? এত দূরে ছুটে এসেছ! বল বল দেবী কাদম্বরী ভাল আছেন?"

কেয়ূরক বাষ্পকণ্ঠে বলিল—"ভাল নেই বলিয়াই ছুটে এসেছি। আপনার বাড়ী যাওয়ার সংবাদ শুনে দেবীর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই, দেবী মহাশ্বেতা খিন্নহৃদয়ে তপোবনে ফিরে গেছেন! গন্ধর্ব্ব নগর আজ উৎসবশূন্য—শোকাকুল!"

পত্রলেখা সোৎকণ্ঠে বলিল—"মহাশ্বেতা তপোবনে ফিরে গেছেন! কি সর্ব্বনাশ!"

কুমার পত্রলেখার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ আর বেশী

কি পত্রলেখে! এখনও যা কিছু বাকি আছে, এইবার বুঝি ষোল কলায় পূর্ণ হয়!"

দূত আসিরা বলিল—"কুমার! আপনার সৈন্য সামন্ত নিয়ে সেনাপতি নগরের বাহিরে ফিরে এসেছেন। মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন আসেন নাই! তিনি অচ্ছোদ সরোবর তীর হইতে ফিরিবেন না বলিয়াছেন।"

কুমার আর্ত্তস্বরে বলিলেন—"সখাও আমায় ত্যাগ করলে! কে আমায় এমন সময় সান্ত্বনা দেবে?"

পরক্ষণেই মহারাজ তারাপীড় আসিয়া বলিলেন—"কুমার! বৈশম্পা-য়নের বৃত্তান্ত শুনে তাহার পিতামাতা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। যদিও তুমি এই সেদিন ফিরে এলে, তথাপি আমরা বৈশম্পায়নকে না দেখে সম্পূর্ণ সুখ ভোগ করতে পারিতেছি না, তুমি অবিলম্বে সেখানে যাইয়া তাহাকে লইয়া এস। তুমি ছাড়া কেহ তাহাকে আনিতে পারিবে না!"

কুমার সাশ্রুকণ্ঠে পিতার পদধূলি লইয়া বলিলেন—"যে আজ্ঞা।"

(১০)

সেদিন শুক্লা চতুর্দ্দশী। চন্দ্রদেবের রজতধারা মহাশ্বেতার তপোবনের উপর যেন পুঞ্জীভূত হইয়া প্রসারিত হইতেছিল। তখন অনেক রাত্রি, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, সুষুপ্তিমগ্ন। এমন সময়ে তপোবনের চতুর্দ্দিক মথিত করিয়া, মাধুর্য্যে, বেদনায় আলোড়িত করিয়া সঙ্গীত তরঙ্গ আকাশে ভাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গীতের সঙ্গে বীণার তন্ত্রীগুলাও যেন বুকফাটা ক্রন্দন লইয়া সাড়া দিয়া উঠিতেছিল।

বৈশম্পায়ন তখন সেই তপোবনের একপার্শ্বে একখণ্ড শিলার উপর বসিয়া করলগ্ন কপোলে কি ভাবিতেছিল। সঙ্গীতের শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর যৌবনোচ্ছ্বসিত মুখমণ্ডলে কালিমা পড়িয়া বিষাদের চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পরিধানের বস্ত্র আলু থালু, কেশ রুক্ষ, চক্ষু দীন, বাষ্পপূর্ণ আরক্ত। সে তখন সেই প্রথম শ্রুত অপূর্ব্ব সঙ্গীত লহরী শুনিয়া যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

"একি! সঙ্গীতের মধ্য দিয়া এমন অমৃতধারা আমার প্রাণকে এমন আলোড়িত করিল কেন? এই তপোবনের সবই কি ইন্দ্রজাল না মায়া? আমার জীবনটাকে নিয়ে এমন করে খেলা করার কি উদ্দেশ্য? এই তপোবনের সীমা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিবার শক্তি ত হারাইয়াছি, কিন্তু আজ এযে আরও আয়োজন? আমি যাহা চাই, এযে তাহার অতি নিকট থেকে যেন ভেসে আসছে। সেই অতি সুন্দরের স্মৃতি নিয়ে—রূপ নিয়ে এ যেন আকাশ থেকে নেমে আস্‌ছে! গানের সঙ্গে সেন আমার প্রাণের দেবতা জড় হয়ে পিণ্ডিত হয়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর্‌ছে! যাই—যাই!!" উন্মত্তবৎ বৈশম্পায়ন সঙ্গীতের সুর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

আশ্রমের একপার্শ্বে আচ্ছাদ সরোবর। সেই সরোবরের একটু দূরে মহাদেবের মন্দির। কাদম্বরীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাশ্বেতা সেই রাত্রেই মহাদেবের প্রশস্ত চত্বরে বসিয়া হৃদয় বেদনা অনন্তের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছিল। তাহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র; শুভ্র উত্তরীয় স্কন্ধ, বক্ষ ও পৃষ্ঠ দেশে সযত্ন বিন্যস্ত। আলুলায়িত কেশ কলাপের উপর দিয়া ঘেরা একটী শুভ্র পুষ্প মাল্য মস্তকের উপর সম্বদ্ধ। হস্তে বীণা, এই বেশে মহাশ্বেতাকে তখন দেবী সরস্বতীর মতই বোধ হইতেছিল।

ছুটিয়া আসিয়া বৈশম্পায়ন হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া মহাশ্বেতার সম্মুখে দাঁড়াইল। অনিমেষ দৃষ্টিতে মহাশ্বেতার পানে তাকাইয়া তাকাইয়া যেন কি সে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। যেন কি তাহার হারাইয়াছে, অথচ

তুল্যাকৃতি অপর জিনিষ সে পাইয়া যেন নিজের বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। পরিচয় নাই অথচ যেন পরিচয়, প্রণয় নাই অথচ যেন তাহার সঙ্গে কত প্রণয়, প্রেম নাই অথচ যেন প্রেমের গাঢ় অনুভব, প্রীতি না হইলেও যেন কত পরাধীনতা, দুঃখ থাকিলেও যেন কত সুখ, প্রার্থনা না থাকিলেও যেন আত্মনিবেদন, প্রশ্ন না থাকিলেও যেন কত কথা, জিজ্ঞাসা না থাকিলেও যেন দুঃখের নিবেদন, এই রকমই তাহার তখন ভাব, অবস্থা উপস্থিত হইল। সে যেন তখন অনুতাপ করিয়া হাঁসিয়া, কাঁদিয়া, ভীত হইয়া, নাচিয়া, স্মরণ করিয়া, আবার পরক্ষণে ভুলিয়া গিয়া, নূতন নূতন ভাবে আক্রান্ত হইতেছিল। তাহার মস্তিষ্কের কিছুই স্থিরতা ছিল না।

মহাশ্বেতার গান থামিল। তখন মন্দিরের মধ্যে বীণাটী রাখিয়া বাহিরে আসিয়া চাহিয়া দেখিল—বৈশম্পায়ন আকর্ণবিস্তৃত নয়ন দ্বারা তাহার দিকে চাহিয়া মত্তের ন্যায়, আবিষ্টের ন্যায়, বিরহীর ন্যায়, যেন তাহাকে পান করিতেছে, যেন তাহাকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে, যেন তাহাকে তীব্র ভাবে আকর্ষণ করিতেছে।

বৈশম্পায়ন অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"অতি সুন্দর! দেবি! তুমি অতি সুন্দর!! কিন্তু একি দেবি! তোমার এ বেশ যে আশা করিনি দেবি! তোমার জন্ম, বয়স, আকৃতির ত এ বেশ উপযোগী নয়! আমার মনের মধ্যে তোমার সেই চির উজ্জ্বল দীপ্তময়ী সৌভাগ্যমণ্ডিতা মূর্ত্তিটী যেন এখনও সজাগ রয়েছে; সেই বেশ পরিধান করে এই তপস্যা ক্লেশ ত্যাগ করে আবার হাস্যমুখে দাঁড়াও দেবী! আমাকে কৃতার্থ কর, আমি তোমাকে বরণ করিয়া লই!"

মহাশ্বেতা এই অশনি সম্পাতবৎ দুর্ব্বিসহ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"আঃ পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রীর প্রতি এই উক্তি করিতে তোর লজ্জা হইল না!

দেখিতেছি তুমি ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের একি আচার? যাও, অন্তহিত হও আমার এই সতীত্ব-গর্ব্বিত দেহে ও অন্তঃকরণে পর পুরুষের চিন্তার চিহ্ন মাত্রও অঙ্কিত হইবে না।" মহাশ্বেতা সবেগে সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল। বৈশম্পায়ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কোথা হইতে পত্রলেখা ছুটিয়া আসিয়া বৈশম্পায়নকে সুস্থ করিয়া বলিল—"মিলিবে, তোমার অভীষ্ট নিশ্চয় মিলিবে। জন্মান্তরে এই মহাশ্বেতাই তোমার পত্নী ছিল।"

বৈশম্পায়ন প্রবুদ্ধ হইয়া বলিল—"ম—হা—শ্বে—তা! উঃ—বহুদূর! যেন বহুদূর থেকে কি একটা স্বপ্ন ভেসে আস্‌ছে। ধর্‌তে পারছিনা পত্রলেখা!"

পত্রলেখা সবেগে বলিল—"ব্যাকুল হবেন না, নিশ্চয় ধর্‌তে পাবেন; আমি এখন দেবী কাদম্বরীর নিকট কুমারের সংবাদ লইয়া যাইতেছি। তিনি এলেন বলে, এই তপোবনেই আপনাদের মিলন হইবে।"

বৈশম্পায়ন বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে আশা দুরাশা পত্রলেখা! আমার জীবন বুঝি যায়! তবে সত্বর এস—এই রাত্রে কেমন করে যাবে?"

পত্রলেখা। "লোক জন সঙ্গে আছে, আমাকে যেতেই হবে, দেবী কাদম্বরীকে এখানে আন্‌তে হবে।" পত্রলেখা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

(১১)

বৈশম্পায়ন ও কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের জীবনের দুইটী উজ্জ্বল আলোক। শৈশবের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশম্পায়নের সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়ের যে একটা বন্ধন পড়িয়াছিল—তাহা আজ পুষ্ট, বর্দ্ধিত, ফলফুলে পূর্ণ। আর কাদম্বরী তাঁহার যৌবনের কামনা, ভবিষ্যতের শান্তি, বর্ত্তমানের সুখ;

কাদম্বরী আজ অভ্যাগত, যেন জন্মান্তরে পরিচিত নূতন অতিথি। এই অতিথিকে বরণ করিয়া লইয়া চন্দ্রাপীড়ের স্নেহময় কান্ত কোমল হৃদয় যতই কেন অনুরাগের কামনার স্রোতে ভাসিয়া যাউক না কিন্তু বৈশম্পায়নের এই বিপদের সংবাদে সেই হৃদয়ই আজ বড় বেসুরা হইয়া উঠিতে ছিল। তাই আজ বর্ত্তমানের আশা, সুখকে চাপা দিয়া চন্দ্রাপীড় অতীতের সেই কামনাহীন গাঢ় প্রেমের উত্তেজনায় আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাই রাজধানী হইতে বাহির হইয়া জ্ঞানশূন্যের ন্যায় বৈশম্পায়নের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

সম্মুখে সেই পুণ্ডরীকের অনন্ত স্বপ্নের চির-সমাধি—প্রেমের সেই পরিণাম ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী মহাশ্বেতার আশ্রম। এই খানেই সখা বৈশম্পায়ন আছে। এইখানে সে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। এইখানেই তাহার সঙ্গে কি মিলন হইবে না? মনে পড়ে সেই শৈশবের ভালবাসা, কৈশোরের অনন্যপরায়ণতা, যৌবনের বিশ্রাম নিকেতন! সেই বৈশম্পায়ন আজ তাহাকে ছাড়িয়া তাহার বন্ধুত্বের আকর্ষণ, সখিত্বের সম্মানকে বিসর্জ্জন দিয়া কিনা অক্লেশে বলিয়া পাঠাইয়াছে আমি যাইব না, এখানেই থাকিব? কেন আমা হইতে কি এই অরণ্য, এই আশ্রম বড় হইল নাকি? অভিমানে চন্দ্রাপীড়ের চক্ষু হইতে বাষ্পরাশি নির্গত হইয়া তাহার গণ্ড ভাসাইয়া দিল। পরক্ষণেই আবার চন্দ্রাপীড় ভাবিল—না না সে যে আমা ভিন্ন আর কিছু জানেনা, সেত আমাকে ভুলিতে পারে না, আমার প্রেমবন্ধন দূর করিবার ত তাহার সাধ্য নাই। নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। নিশ্চয় সেই অরণ্যের মধ্যে কোন অশরীরিণী দৈবীমায়া তাহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। নিশ্চয়ই সে জ্ঞানহারা হইয়া, উন্মাদ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাই সে বলিয়া পাঠাইয়াছে—"আমি বাড়ী

যাইবনা।" দাঁড়াও সখা! আমি এলাম বলে, তোমার জীবনের উপর ায়াস্মৃতির মরীচিকাজাল ছিন্ন করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়া আপনার করিয়া লইব। তোমার কিছু ভয় নাই।" চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রায়ুধ নামক অশ্বে ড়িয়া বায়ুবেগে অগ্রসর হইলেন!

আশ্রম নিস্তব্ধ, কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নাই। চন্দ্রাপীড় িতস্তত একবার সভয় চক্ষে চাহিয়া মহাশ্বেতার অন্বেষণে চলিলেন, ভাবিলেন তাহার নিকট যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়। মহাশ্বেতা যস্থলে থাকিতেন সে স্থান কুমারের পরিচিত, তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী ইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। পার্শ্বচরের হস্তে সেই অশ্বরক্ষার ভার দিয়া তিনি মহাশ্বেতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাশ্বেতা তখন অধো- খে, বাষ্পপূরিতকণ্ঠে অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে ছিলেন। তাহার হৃদয়টা অসহ্য শোকাবেগে উৎকণ্ঠিত হইতেছিল, শরীর ক্ষীণ, মুখ পাণ্ডু. যন বাতাহত লতার ন্যায় তাহার অঙ্গযষ্টি সেই স্থলে বিশীর্ণ হইয়া লুটাইতেছিল।

চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার সেই অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রাণটা ভয়ে যেন উড়ু উড়ু করিতেছিল, তিনি কোন রকমে এক ও শিলার উপর বসিয়া পড়িয়া মহাশ্বেতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহাশ্বেতা শোকাবেগে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"কি বলিব কুমার! য জন্য আসিয়াছেন তাহা সব জানি। পোড়া অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়া অবধি খী ত কাহাকে করিতে পারিলাম না, যে আমার সংসর্গে আসিয়াছে, সেই মরুন্তুদ যন্ত্রনা লইয়া ফিরিয়াছে। আপনার বাড়ী যাওয়ার সংবাদ শুনে খিন্নহৃদয়ে ভাবিলাম,—আমার দ্বারা ত মহারাজ চিত্ররথের অভিলাষ পূর্ণ

হইল না, দেবী মদিরারও প্রার্থনা সফল হইল না, নিজেরও কোন অভীষ্ট সাধিত হইল না, বিশেষতঃ সখী কাদম্বরীকে ত অসহ্য দুঃখের ভারে প্রপীড়িত করিলাম, সুখী করিতে পারিলাম না। এই সমস্ত ভাবিয়া সংসারের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া এই অরণ্যে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু এখানেও বিপদ।

একদিন রাত্রে আপনারই তুল্যাকৃতি একটী ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিলাম। সে হতভাগা আমার প্রণয় কামনা করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। তাহার সেই উন্মাদনাময় ভাবভঙ্গী দেখিয়া—তাহার সেই আবেগোৎফুল্ল একটানা কামনার উচ্ছ্বাস দেখিয়া সেই রাত্রি অপ্রসন্নহৃদয়ে কাটাইলাম।

তার পরদিন পুর্ণিমারজনী। চতুর্দ্দিকে যেন জ্যোৎস্নাধারার ভিতর দিয়া জলন্ত কামনার বাণগুলি কামদেবের তুণীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তখন রাত্রি অনেক। আমি কোথাও শান্তি না পাইয়া এই শিলাতলে অবশ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিদিক হইতে কুমুদ-কহ্লার-সুরভি পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া আমাকে যেন ব্যজন করিতেছিল। মাথার উপরে চন্দ্রদেব নিজের শুভ্র করে সুধা ধবল তুলিকা গ্রহণ করিয়া দশদিকে সাদা রং মাখাইয়া দিতেছিলেন। আমি তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া দেব পুণ্ডরীকের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। সেই 'আশ্বাসবাণী' তখন যেন স্পষ্ট হইয়া আমার কানে বাজিতেছিল। "পুণ্ডরীক আসিবে, তাহার দর্শন মিলিবে," কবে আসিবে? কি প্রকারে আসিবে? কেনই বা আশ্বাস? সখা কপিঞ্জলেরই বা সংবাদ নাই কেন? সেই যে আকাশে উঠিয়া গেল একবার আসিয়া আমার খোঁজ লইল না কেন? এইরূপ চিন্তাস্রোতে হাবুডুবু খাইয়া যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছিলাম।

এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণ যুবক ধীর পদ সঞ্চারে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শরীর রোমাঞ্চ পূর্ণ, কম্পিত, যেন তাহার শরীরে মদন শর বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার নয়নে জল, মুখ বিষাদ-কাতর, গাত্র স্বেদ-স্বিন্ন, হৃদয়ে গাঢ় উৎকণ্ঠা, হস্ত প্রসারিত—যেন আমাকে আলিঙ্গনে উদ্যত, তাহার তখন সত্য তিরোহিত, ধৃষ্টতা অধিগত, বিচার-বিবেক অন্তর্হিত, সে কেবল কামের বশে আবিষ্ট। তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম।

সে তখন আমার নিকটে আসিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল—"দেবি! আমার মৃত্যু আসন্ন, আমায় রক্ষা কর। তুমি না রাখিলে আমি বাঁচিব না।"

আমি তাহার সেই পাপ কঠোর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম—"আ পাপ! এই রকম বলিলেও কি তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না? জিহ্বা খসিয়া পড়িল না? বাগ্ বিহ্বল হইল না? অক্ষর নষ্ট হইল না? মনে হয় তোর শরীরে পঞ্চ ভূতের কোন অংশই নাই? এই বৈশ্বানর অগ্নি তোকে ভস্ম করিল না? বায়ু তোকে কম্পিত করিল না? জল তোকে প্লাবিত করিল না? ধরিত্রী দেবী তোকে রসাতলে লইয়া গেলেন না? আকাশও তোকে শূন্য করিয়া ফেলিল না? তির্য্যক্ জাতির ন্যায় কামচারী হইয়া শুকপক্ষীর ন্যায় স্থানাস্থান বিবেচনারহিত হইয়া যখন এই রকম বলিতেছিস্, তখন কেন তুই সেই শুক জাতিতে নিক্ষিপ্ত হইলি না?"

এইরূপ বলিয়া চন্দ্রদেবের দিকে পুনর্ব্বার দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলাম—"হে ভগবন্! সকল ভুবনের চূড়ামণি! যদি আমি দেব পুণ্ডরীকের দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া মনেও পরপুরুষকে চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে আমার এই সতীবাক্য যেন সফল হয়, যেন এই কামচারী শুকজাতিতে পতিত হয়।"

আমার বাক্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্রাহ্মণ যুবক ছিন্নমূলতরুর ন্যায় অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাহার জীবন নষ্ট হইয়া গেল। তারপর লোকপরম্পরায় শুনিলাম—সেই ব্রাহ্মণ আপনার অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব বৈশম্পায়ন।"

চন্দ্রাপীড় উন্মাদের ন্যায় বলিলেন—"কি? কি? বান্ধব বৈশম্পায়ন! দেবি! দেবি! আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে! শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছে! পৃথিবীটা যেন ঘুরছে! হায়! দেবী কাদম্বরি! হায় মহাশ্বেতে! জন্মান্তরে আমাদের মিলনে যেন তোমার সাহায্য পাই।" বলিতে বলিতেই চন্দ্রা-পীড়ের "হৃদয়মস্ফুটং" হৃদয় স্ফুটিত হইয়া গেল।

কোথা হইতে পত্রলেখা দৌড়াইয়া আসিয়া পরিজনের নিকট হইতে ইন্দ্রায়ুধ অশ্বকে কাড়িয়া লইয়া বলিল—"আমাদের যাহা তাহা হইলেও হইতে পারে, আপনি যে একাকী বাহন ব্যতিরেকে দূরে গিয়ে একপাও থাকিতে পারেন না।" বলিয়াই সে অশ্বের সহিত অচ্ছোদ সরোবরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরক্ষণেই কাদম্বরী উন্মাদের ন্যায় আসিয়া চন্দ্রপীড়ের বক্ষঃস্থলে লুটাইয়া পড়িল।

চন্দ্রদেব ও রোহিণী স্বস্থানে পুনর্মিলিত হইলেন।

সম্পূর্ণ